দিয়াশলাই

দিয়াশলাই

১০০% মাহমুদুর রহমান রাজু সংকলন

উৎসর্গ

আমার আব্বা, আম্মা, আমি এবং আমার ছোট বোন, এই চার জন মিলে যে নিরবিচ্ছিন্ন সাদামাটা পরিবার, সেখানে কোনদিনও যেমন বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তেমনি কোন বড় ঘটনাও ঘটেনি। আমরা যা চেয়েছি তার সবকিছুই পেয়েছি, হয়তো একটু সময় লেগেছে।

লেখকের অন্যান্য বই

নাচের পুতুল (উপন্যাস)
প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১০
দুলর্ভ পাপ (উপন্যাস)
প্রকাশ : জুলাই ২০১০

নিবেদন

অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি বড় ধরনের একটা বিপর্যয় ছাড়া বাংলাদেশে পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়। অতীতে দেখা গেছে যখন কোন সমাজের একটি শ্রেণী দুর্নীতিগ্রস্ হয়েছে, তখন অন্য শ্রেনী বিপব করে জাতিকে ফিরিয়ে এনেছে, যেমন ফেঞ্চ বিপব, রাশান বিপব, ইরানী বিপব ইত্যাদি। কিন্তু কোন সমাজের সবাই যদি দুর্নীতিগ্রস্থ হয়, কথন বিপব করবে কে? তখন মহাবিপর্যয় ছাড়া ঐ জাতির আর কোন পথ থাকেনা পরিবর্তনের। নূহ্ নবীর পাবন বা হাইতির ভূমিকম্পের মতো কিছু একটা দরকার।

বাংলাদেশ একটা আজব দেশ। এদেশে কেউই আইন মানেনা অথচ বড় কোন গোলমালও হচ্ছে না। আসলে গোলমাল করার মত রিস্কেও কেউ যেতে চায়না। সবাই চায় গা বাঁচিয়ে দুর্নীতি করে সুখে থাকতে। একটা রিস্কি মহাপ্রলয়ের প্রত্যাশায় আমার গল্প গুলি লেখা। যে ১৩ টি গল্প এই বইয়ে জায়গা পেয়েছে তার প্রত্যেকটি একেকটি বারুদ মুখো কাঠি, সমাজটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিতে সক্ষম। তাই বইয়ের নাম রাখলাম "দিয়াশলাই"।

এখানকার বেশ কয়েকটি গল্প দৈনিক ইনকিলাবের সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়েছে। ইনকিলাবের সাহিত্য সম্পাদক হাসান মুস্ তাফিজুর রহমান ভাইয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রায় সবগুলি গল্প 'সামহয়ার ইন'' বগেও প্রকাশিত।

আমার কয়েকজন কলিগ ও বন্ধু গল্পগুলি পড়ে, মন্ব্য করে, পরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও সমৃদ্ধ করেছে। একজন

লেখকের জীবনে এমন কলিগ ও বন্ধু পাওয়া খুবই দরকারী, তা না হলে লেখায় অনেক ভূল-ভ্রান্তি থেকে যায়।

গল্পগুলির পট এবং চরিত্রগুলি আমাদের চারপাশেরই এবং অতিপরিচিত। আমরা নিজেরা যখন কোন অন্যায় করি তখন তার পিছনে যুক্তি খুঁজি, আর যখন অন্যকেউ আমাদের উপর অন্যায় করে তখন চেঁচামেচি করি। তাও আবার মৃদু স্বরে। নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো এদেশে কেউ নেই। তাই একটা মহাবিপর্যয় দরকার।

মাহমুদুর রহমান রাজু
১৩ জানুয়ারি ২০১১
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সূচীপত্র

চাঁদের আলো লিঃ	১১
চোর, বাটপার ও চামারের গল্প	১৪
পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংস অথবা আমেরিকান লাইফ স্টাইল	১৬
কাউয়া পাখি জিন্দাবাদ	২০
জনগন-ই সকল ক্ষমতার উৎস	২৩
রবিন হুডি	২৫
উসাইন বোল্ট	৩০
বড়শি কন্যা	৩৩
ছবিওয়ালা ও হাটুরে	৩৬
২১শে ফেব্রুয়ারী	৩৮
মানব দূষণ	৪৫
সূখী মানুষের জামা	৫১
সময়ের ঝুল	৫৪

চাঁদের আলো লিঃ

'দি নিউ মুন কোম্পানী'র পক্ষ থেকে একটি প্রেস কন্‌ফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে নিউ ইয়র্কের একমাত্র দশ তারকা হোটেল মানহাটনে। বিশ্বখ্যাত সব মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত, সবাই কানঘুষা করছে, তবে কেউই সঠিক বলতে পারছেনা কি হতে যাচ্ছে। কোন প্রেস রিলিজও দেওয়া হচ্ছেনা। কেন তাদের দাওয়াত দেওয়া হল? এর মধ্যে হঠাৎ করে ঘরের সব বাতি নিভে গেল, সামনের হলোগ্রাম স্ক্রিনে ভেসে উঠল চাঁদের থ্রিডি ছবি। শুধু তাইনা, চাঁদ যে প্রবল গতিতে আপন কক্ষপথে ছুটছে তাও অনুভব করল উপস্থিত সবাই। পুরো অডিটোরিয়ামটা যেন মহাশুন্যে ভাসছে। মাথার উপর তারার মত ছোট ছোট বাতি জ্বলছে।

আবার অন্ধকার। এবার মঞ্চের উপর একটি আলো জ্বলে উঠল। তাতে দেখা গেল 'দি নিউ মুন কোম্পানী'র সিইও জোসেফ পিটারসন কে। দেরি না করে তিনি শুরু করলেন, "লেডিস এন্ড জেন্টল ম্যান, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ একটি স্মরনীয় দিন। এই বিশেষ দিনের বিশেষ মুহুর্তের সাক্ষী আপনারা। আপনারা ভাগ্যবান।"

দর্শক সারিতে উসখুশ শুরু হয়ে গেল। আবার সিইও, "মাত্র ১০ মিনিট আগে নাসা'র কাছ থেকে আমরা চাঁদের ইজারা নিলাম.."। পিছন থেকে একজন.জোরে হাততালি শুরু করল। সম্ভবত এই কোম্পানীরই কেউ এক জন হবে। আস্তে আস্তে সবাই হাততালি দিল। সিইও হাততালি শেষ হওয়ার জন্যে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর একটু হেসে আবারও শুরু করল, "শুধু তাই না আপনার জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমরা চাঁদের সংস্কারে এক বিরাট প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছি। চাঁদকে আমরা বদলে দিতে চাই। আমরা গবেষণা করে দেখেছি চাঁদের মুল প্রোডাক্ট হল চাঁদের আলো। এই আলোর কোয়ালিটি বাড়ানো কিভাবে যায় তা নিয়ে গবেষণা করেছে আমাদের বিশেষজ্ঞ গবেষক দল। তারা আবিস্কার করেছে এক ধরনের নতুন রিফলেকটর পেপার, যাতে বাধা পেলে সূর্য্যের আলোর তীব্রতা ৬ গুণ

বৃদ্ধি পায় কিন্তু উত্তাপ্ত বাড়ে না"। ঠিক তখন পেছনের হলোগ্রামে দেখা যাচ্ছে, এক ধরনের রূপালী কাগজে ঢেকে যাচ্ছে চাঁদ। আমেরিকান বার্গার যে কাগজে মোড়া থাকে অনেকটা সেই রকম কাগজ। সেদিকে আঁড় ছোখে তাকিয়ে, ঠোটে বাকা হাসি মেখে আবারও মুখ খুলল সিইও, "হ্যাঁ, এই কাগজে মুড়ে দেওয়া হবে গোটা চাঁদটাকে। এতে চাঁদের আলো হবে আরও উজ্জ্বল, সিগ্ধ আর কোমল। ঠিক যেমনটা আপনারা কল্পনা করেছেন এতদিন। এতে আমাদের খরচ হচ্ছে ৮ ট্রিলিয়ন ডলার.."।

"তাতে আপনাদের লাভ কি?" সিইওকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল দর্শক সারি থেকে একজন সাংবাদিক।

সিইও প্রশ্নকারীর চোখে চোখ রেখে, "ভেরি গুড প্রশ্ন", তারপর একটু ডানে এগিয়ে তিনি বললেন, "যেহেতু পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষই চাঁদের আলো খুব পছন্দ করে এবং এই পদ্ধতির বাড়তি আলো তাদের মনকে আরো প্রফুল্ল করবে-মুগ্ধ করবে, তাই তারা আমাদের পে করবে! প্রতি দেশে আমাদের ডিলার বা এজেন্ট থাকবে। খুবই সহজ সিস্টেম!"

একজন সাংবাদিক দাড়িয়ে বলল, "কিন্তু কোন দেশ যদি পে করতে না চায়?" সিইও'র ঝটপট উত্তর, "এটা কেমন কথা! সার্ভিস নেবে আর পে করবে না? তাহলে 'ডাব্লিউ টি ও' আছে কেন?"

অন্য একজন সাংবাদিক বলল, "এমন অনেক দেশ আছে যারা খাবারই কিনতে পারছে না, তারা চাঁদের আলো কিনবে কিভাবে?" সিইও, "তারা যাতে চাঁদের আলো কিনতে পারে সেই জন্যে 'ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'-'আই এম এফ' তাদের সহজ শর্তে লোন দেবে! শুধু তাই নয়, অতি দরিদ্রদের জন্য থাকছে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম! এর মাধ্যমে তারাও চাঁদের আলো কিনতে পারবে, স্বাদ পাবে এক অনিন্দ সুন্দর রোমান্টিক জীবনের। আমরা তাদের জীবন-মান উন্নয়নে উদ্যেগ নিয়েছি কাজেই 'জাতিসংঘ'ও আমাদের সহযোগিতা করবে। আর কোন কথা নয় চলুন আমরা ডিনার করি। আপনাদের জন্যে রয়েছে মঙ্গল গ্রহে উৎপাদিত 'লাল শাকের বিরিয়ানি'"

এর ১০বছর পরঃ

টোকিও শহরে নিজ বাড়ির ছাদে বসে কেনা চাঁদের আলোয় কবিতা লিখছে একজন জাপানি কবিঃ

পৃথিবী এখন দারুন টেস্টি,
পূর্নিমার চাঁদ যেন টক-ঝাল-মিষ্টি।

আর পর পর ৬ বছর চাঁদের আলোর লোনের টাকা শোধ করতে পারেনি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দরিদ্র দেশ, বাংলাদেশ। এজন্যে ঐ দেশের অধিকাংশ মানুষের চোখে কাল টেপ মেরে দিয়েছে 'দি নিউ মুন কোম্পানী'র এজেন্ট। তবে সে দেশের একটি ক্লাব, নাম 'ঢাকা ক্লাব' তারা 'দি নিউ মুন কোম্পানী'র কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হওয়ায় আলো দেখার সুযোগ পাচ্ছে। বাকিরা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পথ চলে, কাজ করে আর এফ এম রেডিওতে শোনে-"যদি চাঁদের আলো কিনতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপসনে গিয়ে লিখুন চাঁদের আলো (স্পেস) আপনার নাম আর পাঠিয়ে দিন ৬৬৬ নম্বরে।

চোর, বাটপার ও চামারের গল্প

ব্যাংক থেকে চোখ মুখ কুচকে, রাগে গজগজ করতে করতে বের হল হামিদ স্যার, ঢাকা কলেজের ইংরেজীর টিচার। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ৩ তলার বাড়িটিকে ৬ তলা করবেন। আর এজন্যে ৪০ লাখ টাকা লোন নিতে গেলে ৫ লাখ টাকাই ঘুষ খেলেন ব্যাংক ম্যানেজার ইব্রাহিম তালুকদার। আর তার জন্যেই হামিদ স্যার এত ক্ষেপে গেলেন। রাগে গজগজ করতে করতে হামিদ স্যার বললেন, "শালা চোর একটা! মাথার উপর বাড়ি দিয়ে ৫ লাখ টাকা ঘুষ নিল। চোর ছ্যাঁচড়ে দেশটা ভরে গেছে"। 'চোর'

তবে বাসায় ফিরে ড্রয়িং রুমে উকি দিতেই তার রাগ পানি হয়ে গেল। ঘরভারা ছাত্র-ছাত্রী। ১ ব্যাচে ৫০ জন করে পড়ান, সপ্তাহে ২ দিন, মাসে ২০০০ টাকা। সকাল ৭ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ব্যাচে পড়ান। মাঝে ১ ঘন্টা কলেজে গিয়ে কোন দিন ক্লাস নেন, কোন দিন হাজিরা দিয়ে চলে আসেন। ব্যাংক একাউন্টে প্রতি মাসে কত টাকা জমা হয় এই মুহুর্তে তার মনে পড়ছে না। সকালের নাস্তা থেকে রাতের ডিনার, সব কিছুই করেন প্রাইভেট পড়ানোর ফাকে ফাকে। এক বার তার নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, "তিনি কি কোন দুর্নীতি করছেন?" আবার নিজের মন থেকেই উত্তর এল, "তা হবে কেন? আমি তো চুরি করছি না। পরিশ্রম করে বাড়তি উপার্জন করছি। কলেজে গিয়ে পড়াইনা, সে তো ছাত্রদের আগ্রহ নাই বলে। এ যুগের ছাত্রদের লেখাপড়ার বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই। সারাদিন শুধু প্রেম-প্রীতি। আর আমাদের যুগে..."

ব্যাংক ম্যানেজার ইব্রাহীম তালুকদার এক কলেজ টিচারের কাছ থেকে আজ ৫ লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছেন, মনটা তাই বেজায় ভালো। আজ বরং একটু বেশী সময় অফিসে থাকলেন। ৫টা বাজল তার পর বের হলেন। বের হবার পথে গার্ডের সঙ্গে একটু কথাও বললেন। তার ফ্যামিলির খোজ-খবর নিলেন। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা টা একটু মচকে গেল। কি আর করা; বাসায় না গিয়ে একজন 'বোন' বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলেন। দেশ বরেণ্য ডাক্তার, ভিজিট ৮০০ টাকা, সামনের বারান্দায় লম্বা লাইন। ডাক্তারের সামনে বসতেই ডাক্তার সাহেব

জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সমস্যা?" কিন্তু উত্তরটা শেষ করতে পারলেননা ব্যাংক ম্যানেজার। ডাক্তার সাহেব উত্তর শোনার জন্যে প্রশ্নটি করেননি, প্রেসক্রিপশন প্যাড আর কলম টেনে নেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় 'টাইম পাস' করার জন্যেই প্রশ্নটি করেছিলেন। যাই হোক ইব্রাহীম তালুকদারের মুখ 'হা' থাকতে থাকতেই ডাক্তার সাহেব একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "৩টা এক্স-রে আর চারটা টেস্ট দিলাম। রিপোর্ট নিয়ে ৫ দিন পর আবার আসেন"। হতভম্ব ব্যাংক ম্যানেজার ইব্রাহীম তালুকদার! তার মুখ এখনও 'হা'। তিনি বুঝলেন না পা মচকে যাবার সাথে 'স্টুল টেস্ট' এর কি সম্পর্ক। ক্লিনিক থেকে বের হবার সময় অনুচ্চ স্বরে বললেন, "শালা বাটপার একটা, মানুষের রক্ত চুষে খায়"। 'বাটপার'

দেশের বিশিষ্ট 'বোন বিশেষজ্ঞ' ডাক্তার হারুন-অর-রশীদ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। হাসপাতালে গেলে রোগীরা ভয়ে তার সঙ্গে কথা বলেনা, গরমের দিনেও ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে। এমন একটা ধমক দেয় যে রোগীদের আত্মা কেঁপে উঠে। সপ্তাহে ২টা ক্লাস নেন আর একবার হাসপাতালের মাঝখানের করিডোর দিয়ে হেঁটে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যান। তারপর সোজা চলে যান নিজের ক্লিনিকে। তিনটি বেসরকারী হাসপাতালেও কনসালটেন্সি করেন তিনি। এর বাইরেও 'ভি.আই.পি' রোগীদের জন্যে একটা সময় রেখেছেন, যদি কেউ ৮০০ টাকা ভিজিট দিয়ে প্রাইভেট ডাক্তার দেখাতে চান। সেখানেও লম্বা লাইন।

ডায়গনেস্টিক সেন্টার গুলি থেকে ৪০% কমিশন পান। ওষুধ কোম্পানী গুলো থেকে প্রতিমাসে লাখ লাখ টাকা জমা হয় তার ব্যাংক একাউন্টে।

ডাক্তার হারুনের একমাত্র ছেলে আয়ান, ঢাকা কলেজে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। রাত ১২ টার সময় বাসায় ঢুকতেই আয়ান তার বাবাকে বলে, "আব্বু আমার চেকটা তো দিলানা"।

"কিসের যেন চেক?"

"ঐযে আমার টিচারদের পেমেন্ট!"

"কত টাকা যেন?"

"ফিফটি 'কে'"

"কি! এত কেন?"

"এত দেখলা কোথায়। ১০টা সাবজেক্টের ব্যাচে ২ করে ২০ হাজার আর বাসার ৩ জন স্যারের ১০ করে ৩০ হাজার এই মোট ৫০ হাজার"।

"৫০ হাজার টাকা মাসে প্রাইভেট টিউশনির বিল? এরা কি শিক্ষক না চামার। রীতিমত চামড়া তুলে নিচ্ছে"। ডাঃ হারুন রাগে গজরাচ্ছে। 'চামার'।

পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংস অথবা আমেরিকান লাইফ স্টাইল

জরিনা বেগম হিজলা গ্রামে বাস করেন। তিন কাঠা জমির উপর একটা পৈত্রিক ভিটা ছাড়া তার বা তার স্বামীর আর কোন সম্পদ নেই। তার স্বামী হেমায়েত আগে ভ্যান চালাতেন। কিন্তু তাতে তার নাকি অনেক কষ্ট হয়। তাই এখন হেমায়েত কিছুই করেন না। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেন, দোকানে আড্ডা দেন এবং তাশ খেলেন। সুখের জীবন তার।

স্বামী কিছু না করাতে তিন সন্তান নিয়ে বেশ বিপদেই পড়েছে জরিনা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে অগ্নীমূল্য! তাই বাধ্য হয়ে জরিনা বেগম যায় 'সুখী ব্যাংকে', মাইক্রোক্রেডিট লোন নেবার জন্যে। গাভী পালনের শর্তে সুখী ব্যাংক তাকে ১০ হাজার টাকা লোন দিল। বাড়ি ফিরল ৯ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে। বাকি ৫০০ টাকা সার্ভিস চার্জ। টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতেই হেমায়েত জরিনার হাত থেকে ২ টা ৫০০ টাকার নোট নিয়ে বাজারে গেল। পোলাওয়ের চাল-দেশী মোরগ-কিসমিস-ডিম-গরম মশলা নিয়ে বাড়ি ফিরল। অনেক দিন পর বাড়িতে কোরমা-পোলাও-ঝাল মাংশ রান্না হল। রান্নার ঘ্রানে আশপাশের সাত গৃহস্থ পাগল হয়ে গেল। তাদের সবাইকে সুস্থ্য করতে বাটি ভরে তরকারী পাঠিয়ে দিয়ে জরিনারা পেট ভরে ডিনার করল। ডিনারের পর সুখের ঢেকুর। ঢেকুরের মৃদু শব্দ মুলিবাঁশের তৈরি ঘরের বেড়ায় প্রতিধ্বনীত হল, অবিরত।

এর দুইদিন পর হাটবার। জরিনা হাটে গিয়ে নিজের জন্যে একটা পাবনার শাড়ি, হেমায়েতের জন্যে একটা লুঙ্গি এবং তিন ছেলেমেয়ের জন্যে তিন সেট ড্রেস কিনে বাড়ি এল। এরপর যে টাকা অবশিষ্ট থাকল তাতে আর গরু কেনা হবেনা, গরুর দাম অনেক। প্লান করতে বসল জরিনা-হেমায়েত। তিন দিন পর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হল-হেমায়েত আমজাদ মিয়ার পুরাতন 'ফনিক্স' সাইকেলটা আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কিনল এবং বাকি টাকা দিয়ে জরিনা ১০ টা হাঁসের বাচ্ছা কিনে তার ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করল। এরপরও হাজার খানেক টাকা হাতে থাকল জরিনার। সে খবর অবশ্য হেমায়েত জানেনা। জরিনা-হেমায়েতের ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন হাসিমুখে স্কুলে যাতায়াতও শুরু করল।

এর মধ্যেই প্রথম কিস্তি শোধ করার সময় এল। জরিনা জমানো ১ হাজার টাকা থেকে পর্যায় ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি শোধ করল। এই কদিন বাড়ির খাওয়া-দাওয়াও বেশ ভালোই হল। হেমায়েত প্রতিদিন সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে গোসল করে। তারপর আবারও গায়ে তেল মেখে-চুলে তেল দিয়ে-চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে-মাঝখানে সিঁতি করে টি স্টলে গিয়ে চা খায়। আড্ডা দেয়।

কদিন পর, জরিনার হাতের টাকা শেষ। পর পর চার সপ্তাহ কিস্তির টাকা শোধ না করায় 'সুখী ব্যাংকে'র লোকজন এসে ঘুরে গেল। জরিনা তাদের কাছে মাফ চাইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন আগামী সপ্তাহেই সব পাওনা শোধ করে দেবেন। কিন্তু কিভাবে দেবেন? হাত তো পুরোপুরি খালি। চিন্তায় ঘুম আসেনা জরিনার, কিন্তু চিন্তা নেই হেমায়েতের, সে সব প্লান ঠিক করে রেখেছে। জরিনাকেও বলল। জরিনারও প্লানটা পছন্দ হয়েছে, আবার ভয়ও করছে।

এভাবে আরও ১ মাস কেটে গেল। ১ টাকাও শোধ করতে পারেনি জরিনা। আরও ১ মাস কেটে গেল। জরিনারা অনেকদিন পোলাও ভাত খায় না। একদিন 'সুখী ব্যাংকে'র লোকজন এসে হেমায়েতের সাইকেল এবং জরিনার হাঁসগুলি ধরে নিয়ে গেল। হাঁসগুলি তখনও ডিম দেওয়া শুরু করেনি। আগের প্লান অনুযায়ী এই ঘটনার পরদিনই জরিনা-হেমায়েত গেল 'নিজের পায়ে চলি' নামক এক এনজিও'র অফিসে। 'নিজের পায়ে চলি' বা 'নিপাচ' 'সুখী ব্যাংকে'র বিরোধী পার্টি। নিপাচ'র কথা হল, "শুধু ঋণ দিলে হবে না, দরিদ্র মানুষদের সাথে সর্বক্ষণ থাকতে হবে-তাদের পথ বাতলে দিতে হবে এবং দারিদ্র বিমোচনে হাতে হাত ধরে কাজ করতে হবে। শুধু ঋণ দিলে গ্রামের মানুষ তা নষ্ট করে ফেলবে"। খুবই সত্য কথা। 'নিপাচ'র বড় আপা জরিনা-হেমায়েতের সব ঘটনা শুনলেন, নোট লিখলেন, ছবি তুললেন, পরদিন জাতীয় দৈনিকে ছবি সহ রিপোর্ট এল, "মাইক্রোক্রেডিট নিয়ে সর্ব শান্ত জরিনা বেগম"।

'নিপাচ' জরিনাকে নগদ এককালীন টাকা দিল যাতে সে 'সুখী ব্যাংকে'র ঋণ শোধ করতে পারে, সাইকেল-হাঁস ছাড়িয়ে আনতে পারে। ঋণ শোধ হল, সাইকেল-হাঁস ছাড়িয়ে আনা হল, আর সেই সাথে আবারও পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংস। তারপর শুরু হল জরিনা বেগমের 'সেলাই মেশিন চালনা প্রশিক্ষণ'। সেই সাথে প্রতিদিন ১০০ টাকা ভাতা। ১ মাস প্রশিক্ষণ শেষে 'নিপাচ' তাকে একটি সেলাই মেশিন দিল। কিস্তিতে এর দাম শোধ দিতে হবে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে জরিনা শুরু করল 'জরিনাস্ ফ্যাশন হাউজ', কিন্তু সমস্যা হল গ্রামের মেয়েরা তো আর দিনে ২ সেট করে জামা বানায় না, তাই ফ্যাশন হাউজ করে মাছ-ভাত

নিশ্চিত করে কিস্তির টাকা শোধ করা যাচ্ছে না। বাকি পড়ল ১ মাসের কিস্তি। জরিনা গোপনে 'সুখী ব্যাংক' থেকে আবারও লোন নিল। আবারও পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংশ, আবারও শাড়ি-লুঙ্গি-নতুন ড্রেস। 'নিপাচ' এর কিস্তিও দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। এভাবে 'সুখী ব্যাংকে'র টাকায় সেলাই মেশিনের কিস্তিশোধ এবং বাদশাহী খাওয়া চলতে থাকল। এমন সময় একদিন 'নিপাচ' এর বড় আপা এসে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন জরিনার প্রথম এককালীন লোনের কথা, যা সে নিয়ে ছিল 'সুখী ব্যাংকে'র প্রথম ঋণ শোধ করার জন্যে। ওহ্হো! জরিনাতো ভুলেই গিয়েছিল! জরিনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

তবে ঠিক মাথার উপর পড়ল না। মাথার উপর ছিল একটা কনক্রিটের ছাদ তার উপর পড়ল আকাশ। এই ছাদের নাম 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এই যাত্রায় বেঁচে গেল জরিনা। নির্বাচন উপলক্ষে 'নিপাচ' এবং 'সখী ব্যাংক', সবাই চুপচাপ। পর্যবেক্ষণ করছে। যে দল জিতবে তার সাথে খাতির করে আবারও কাজ শুরু করা হবে। এদিকে নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামে ব্যাপক টাকার ছড়াছড়ি। মিছিলে গেলেই টাকা, শ্লোগান দিলেই টাকা, পোষ্টার লাগালেই টাকা, প্রতিদিন কড়কড়ে টাকা পকেটে নিয়ে ফিরছে হেমায়েত। আবারও পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংশ। ইলেকশনের পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংস। ইলেকশনের আগের দিন রাতে নগদ কয়েক হাজার টাকা পেল হেমায়েত–জরিনা। নিশ্চিন্তে কেটে গেল আরও দুই মাস। 'সুখী ব্যাংকে'র ম্যানেজার এবং 'নিপাচ' এর বড় আপা দুজনেই জরিনাকে চাপ দিতে থাকল কিস্তি পরিশোধ করার জন্যে। কিন্তু ততদিনে জরিনা শিখে ফেলেছে কিভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকা যায়, কদুর তেল ছাড়াই মাথা ঠান্ডা রেখে ঘুমানো যায়। জরিনা নানান ভাবে ঘোরাতে লাগল ম্যানেজার-বড় আপাকে।

এমন সময় একদিন তিন যুবক এল জরিনার বাড়িতে কি-এক জরিপের কাজে। হেমায়েতের সাথে তাদের কথা হল:

"আপনি যদি আমাদের একটু সহযোগিতা করতেন?"

"তাতে আমার কি লাভ?"

"জ্বি, আপনাদের জীবনমান কিভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে আমরা জরিপ করছি"।

"তাতো বুঝলাম কিন্তু আমার লাভ কি?" হেমায়েত ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল এবং মধ্য আঙ্গুল ঘষে টাকা নির্দেশ করল।

"জ্বি আপনাদের জন্যে একটা সুন্দর মগ আছে"।

"আমরা মগ দিয়ে পানি খাইনা। কল দিয়ে ডাইরেক্ট খাই, ডগ-ডগ করে খাই। আপনারা এইখান থেকে যান। ভাগেন"।

"আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে ৫০ টাকা দেওয়া হবে"।

"আমরা ৫০ টাকায় ইন্টারভু দেইনা। মিনিমাম ৫০০। দিলে দেন, নাইলে ভাগেন"।

অগত্যা সার্ভেকারীরা ১০০০ টাকা দিয়ে হেমায়েত-জরিনার ইন্টারভিউ নিল। আবারো পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংশ। কিস্তির টাকা ফেরত না পেয়ে ম্যানেজার-বড় আপা জরিনাকে আবারও লোন অফার করল। যাতে জরিনা নতুন করে ব্যবসা করে পুরাতন-নতুন দুই কিস্তিই শোধ দিতে পারে। জরিনা গোপনে দুই পক্ষের কাছ থেকেই নতুন করে লোন নিল। আবারো পোলাও-কোর্মা-ঝাল মাংস। পরপর দুই মাস ঠিক মত কিস্তি দিয়ে জরিনা আবারও কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দিল। এভাবেই চলতে থাকল জরিনার দারিদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান। যুদ্ধ। তারপর এক অমাবশ্যার রাতে, ঘরের মধ্যে একটা কুপি জ্বালিয়ে রেখেই জরিনা সপরিবারে উঠে বসল ঢাকার বাসে।

কাউয়া পাখি জিন্দাবাদ

গ্রামের নাম হিজলা। এই গ্রামেরই মেয়ে যুথি। ক্লাস নাইনে পড়ে। বয়স ১৫/১৬। বলবার মত আর তেমন কোন পরিচয় নেই তার। গ্রামের আর দশটা মেয়ের মতই নিম্মবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ে। সরকারী উপবৃত্তির কারণে, বাবা-মা তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেনি। তবে বিয়ের চেষ্টাও চলছে। আর বিয়ের কথা শোনার পর থেকেই যুথি তার হবু বরের কল্পনা শুরু করে দিয়েছে। তাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। কেমন বর চায় সে? পাশের বাড়ির সাথির জামাই আর্মিতে চাকরি করে, ১০ মাস পর ২ মাসের জন্যে ছুটি, তখন বাড়ি আসে। জামাই আর্মিতে চাকরি করার সুবিধা-অসুবিধা দুইটাই আছে। আর বকুলের জামাই মাদ্রাসার টিচার, উহ্ বেশী কথা বলে ব্যাটা, আর বউটারে ঘর থেকে বেরই হতে দেয়না। নাহ্ হুজুর ছেলে বিয়ে করা যাবেনা। ... সারাদিন একটাই চিন্তা যুথির। যদিও এখন পর্যন্ত যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, যুথির কল্পনার সাথে তার ব্যবধান আকাশ-পাতাল বললে খুব কমই বলা হবে। তবুও তার স্বপ্ন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়াল দিচ্ছে বড় বড় ক্যান্টনমেন্ট, মাদ্রাসা, বাজার কিংবা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট চেয়ার কোচের উপর দিয়ে।

বাড়ির পিছনে রান্না ঘরের উঠানে শীতের হালকা রোদে মাদুর বিছিয়ে বসে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়ছে যুথি। এই মুহুর্তে যে গল্পটি সে পড়ছে তার নাম "সমাপ্তি"। গল্পের নায়িকা মৃন্ময়ী আর নায়ক অপু। মৃন্ময়ী গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের চরম দুষ্টু মেয়ে। পড়া লেখা-ঘরের কাজ-শান্ত হয়ে একটু বসে থাকা এসব বিষয়ে তার মোটেও আগ্রহ নেই। পাড়ার সবচেয়ে দুষ্টু ৫/৭ টা ছেলে নিয়ে তার একটা গ্রুপ আছে। মৃন্ময়ী তাদের সভানেত্রী। এই গ্রুপের উদ্দেশ্য হল "অন্যের অনিষ্ট করা এবং যাবতীয় ভালো কাজ থেকে দুরে থাকা।" এ জন্যে অবশ্য মৃন্ময়ীর বাবা-মাকে বেশ কয়েক দফা বিভিন্ন মহলে অপমানিত হতে হয়েছে। কিন্তু তারা এবং প্রতিবেশীরা মৃন্ময়ীকে এবং তার দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরি ব্যার্থ হয়ে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। পাশের তিন গ্রামের কোন গাছের

কোন পাখির বাসায় কয়টি ডিম আছে তা 'মৃন্ময়ী এন্ড গং' এর মুখস্থ। এই তথ্য জানলে অবশ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল মৃন্ময়ীকে "ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ন" খেতাব দিয়ে লাখ টাকার চেক তুলে দিত এবং তা বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার করার জন্যে কোটি টাকা খরচ করত। কিন্তু মৃন্ময়ী এবং মিডিয়ার ব্যাড লাক ব্রিটিশ কাউন্সিল এই খবর পায়নি, পেয়েছে দাড়িওয়ালা এক কবি। যাই হোক ঐ এলাকায় খুব কমই ফড়িং আছে, মৃন্ময়ী যার লেজে সুতা বেধে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখেনি। খব কমই জাবুলানি বাতাবি লেবু আছে যারা মৃন্ময়ীর পাক পদ মুবারকের লাথি খায়নি।

আর গল্পের নায়ক অপু। সে কোলকাতায় পড়াশুনা করে। বাবা বেঁচে নেই কিন্তু বেশ সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারের এক মাত্র ছেলে সে। মা অসুখের কথা বলে তাকে কোলকাতা থেকে ডেকে এনেছে, উদ্দেশ্য বিয়ে দেওয়া। একটা মেয়েকেও ঠিক করে রাখা হয়েছে। সংস্কৃত তত্ত্ব জ্ঞান অনুযায়ী সেই মেয়ে পাত্রী হিসেবে নিঁখুত। সুন্দরী-শান্ত-ভদ্র-সেলাই জানে-প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে-পরিবার বেশ স্বচ্ছল ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত অপুর এই মেয়েকে পছন্দ হল না। হল মৃন্ময়ীকে। এই কথা শুনে অপুর মায়ের হার্ট ফেল করার মত অবস্থা। একেতো মৃন্ময়ী বজ্জাতের হাড্ডি তার উপর আবার ফকির-মিসকিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার কাছে পরাজিত হল সংস্কৃত তত্ত্ব জ্ঞান। অপু মৃন্ময়ীকে বিয়ে করল। এক নিঃশ্বাসে এই পর্যন্ত পড়ল যুথি। বইটা বন্ধ করে রাখল। নিজের ঠোটে চিমটি কাটল। কিছুক্ষণ ভাবল। হু, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যুথিও আজ থেকে মৃন্ময়ীর মত হবে। চরম ডানপিটে-দুষ্টু-চটপটে। এবং একমাত্র এভাবেই সে তার কল্পনার বরকে বিয়ে করতে পারবে। কোন এক অপু তার গলায় পড়িয়ে দেবে মুক্তার মালা, আঙ্গুলে ডায়াগোল্ডের ডায়মন্ড রিং।

এর পরের এক দিনেই যুথি যা করল তাতে রীতিমত অবাক এবং বিরক্ত গ্রামবাসী। মোট ৬টি নালিস এল যুথির বাবা-মা এর কাছে। তারাও অবাক এবং বিরক্ত। ৬টি নালিশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর দুটি হল, যুথি গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের গায়ে ঢিল ছুড়ে মেরেছে, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে পাশের বাড়ির নতুন বৌকে ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দিয়েছে।

এর পরের দিন অর্থাৎ "সমাপ্তি" গল্প পড়ার ৩য় দিনের কথা। রমিজ মিয়ার ছাগলটাকে ধাওয়া দিল যুথি। ছাগল দৌড়ায় আর পিছ পিছ যুথিও দৌড়ায়। দৌড়াতে দৌড়াতে ছাগল আর যুথি চলে এল গ্রাম থেকে একটু দুরে ধান-তিল-পাট ক্ষেতের পাশে। হাপাতে হাপাতে ক্ষেতের আইলের উপর বসে পড়ল যুথি। এর একটু দুরে তিল ক্ষেতে কাজ করছিল চার জন যুবক কৃষক। তারা চারদিক

তাকিয়ে দেখে, আশেপাশে কেউ নেই। তারা এক সাথে উঠে এসে ক্লান্ত যুথিকে অ্যাটাক করল। মুখ চেপে ধরল এক জন। অন্য দুজন যুথির হাত এবং পা ধরে চ্যাংদোলা করে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পাটক্ষেতের মধ্যে। তারপর পর্যায়ক্রমে কুকর্ম সম্পাদন করল।

পরবর্তী ৩ ঘন্টার মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। নিকটবর্তী থানা সদর থেকে নারীবাদী কোন এনজিও প্রতিনিধি আসার আগেই গ্রামের শালিশ বসল। তিন ধর্ষক ধরা পড়েছে, একজন পালিয়ে গেছে। বিচার করবেন গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেব, গত কাল যার গায়ে ঢিল ছুড়ে ছিল যুথি। আধ ঘন্টা বিভিন্ন পক্ষের কথা শুনে চীফ জাস্টিস (ইমাম সাহেব) কোন প্রকার বিব্রত বোধ করা ছাড়াই রায় ঘোষণা করলেন। যুথির গায়ে ১০ ঘা দোররা মারা হবে। তিন ধর্ষক প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা দেবে যুথির বাবাকে এবং ইমাম সাহেবের পা ধরে তওবা করবে। বিচার দেখতে জড়ো হয়েছে আশপাশের সাত গ্রামের লোকজন। তারা গোল হয়ে বিচার দেখছে। রায় ঘোষণা শেষ তবু তারা কেউ নড়ছে না। তারা অপেক্ষা করছে কখন যুথির গায়ে দোররা মারা হবে।

এই হল গল্প।

হু বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

ঈশপ ভাই, আপনাকে এই বিষয়ে একটা বাণী দিতে হবে।

নারে ভাই, বাণী দিতে দিতে আমি ক্লান্ত। পৃথিবীতেতো দেখি খালি বাণী আর দিবসের ছড়াছড়ি। সবার জন্যেই বাণী আছে, চোরের জন্যেও আছে সাধুর জন্যেও আছে। আপনি এখন যান, বাড়িত গিয়া ঘুম দেন।

জনগন-ই সকল ক্ষমতার উৎস

ইবনে ফতুয়া যখন এম ভি সুরভি-৪ থেকে নেমে সদরঘাটে পা রাখলেন তখন কেবল ভোরের আলো ফুটল। কুলিরা সারিবদ্ধ ভাবে দাড়ানোই ছিল কিন্তু ফতুয়ার এক সহযাত্রী সম্পূর্ণ বিনা কারনে একটা জবরদস্ কুলির মুখে ঠাস করে একটা থাপ্পর দিল। বেচারা পিচ্চি চুপ করে রইল, বাকি কুলিরাও নিশ্চুপ। কিন্তু ফতুয়ার অপর এক সহযাত্রী বলে উঠল, "দেন, ওরে আর এক গালে আর একটা থাপ্পর দেন, তা না হলে ওর আর বিয়া হবেনা।" প্রথম সহযাত্রী সত্যি সত্যিই আর একটা থাপ্পর দিল, ফতুয়া অবাক হল। টার্মিনাল ছেড়ে রাস্তায় নামতেই যাত্রীদের জন্যে রাস্তা খালি করে দিল রিক্সাওয়ালারা-সিএনজিওয়ালারা। কোন প্রকার দরদাম ছাড়াই যাত্রীরা একেকটা যানবাহন নিয়ে নিল, এমন কি চালকরা মিটার চালাতে পর্যন্ সাহস করলনা।

সারাদিন শহর ঘুরে ফতুয়া যা দেখল তার সারাংশ হলঃ দেশের জনগণ মিলে একটা সিন্ডিকেট করে ফেলেছে। প্রতিদিনই তারা মাছ-মাংস-শাক-সবজির দাম কমিয়ে দিচ্ছে। নাকানি-চুবানি খাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। রীতিমত কান্না-কাটি করছে তারা। বেশী দামে মাল কিনে কম দামে বেচতে হচ্ছে। জনগণ বাসের ভাড়াও কমিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। কন্ট্রাক্টর বেচারা প্রতিদিনই ঠকছে ভাড়া তুলতে গিয়ে। সরকারী অফিস আদালতে অফিসার-কেরানী সব সময় ভয়ে কাঁপতে থাকে। কাজ করতে একটু দেরী হলেই চড়-থাপ্পর। তাইতো কেউ অফিসে ঢোকার সাথে সাথেই আলোর গতিতে কাজ শুরু করে দেয় তারা।

প্রতিদিনই পুলিশ এখানে জনগনের হাতে পিটুনি খায়। দুই-চার জনকে ক্রসফায়ারেও দিয়েছে জনগণ। সংবাদপত্রের হেড লাইন কি হবে তাও ঠিক করে দেয় জনগন। ইলেকশনের সময় জনগণ ভোট দেয় সবচেয়ে বোকা প্রার্থীকে যাতে পাঁচ বছর তাকে গাধার মত খাটানো যায়। এবং খাটায়ও তাই।

ইবনে ফতুয়া অবাক হয়ে সব দেখছে, বিশ্বের এতগুলি দেশ ঘুরেছে সে, কিন্তু এমন কান্ড কোথাও দেখেনি। বিষয়টা তার কাছে পরিস্কার হল পরের দিন যখন নয়া পল্টনের একটা রাস্তায় লেখা দেখলেন "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস"।

রবিন হুডি

গ্রামের হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে রবিন ভর্তি হল থানা সদরের খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজে। প্রথম মাসখানেক রবিন বাড়ি থেকে সাইকেলে চড়ে কলেজ করল। কিন্তু সাইকেলে চড়ে কলেজে আসায় রবিনের সহপাঠীদের কাছে সে 'দরিদ্র কৃষকের ব্রিলিয়ান্ট ছেলে' হিসেবে অল্প দিনেই পরিচিত হয়ে গেল। সহপাঠী কয়েকটি মেয়ের অতি–সহানুভূতি দিনদিন বাড়তেই থাকল। এই অতি–সহানুভূতি রবিনের আত্মসম্মানে বুলডোজার দিয়ে আঘাত হানল। তাতে আত্মসম্মান ভাঙ্গল, নাকি বুলডোজার ভাঙ্গল? অবশ্যই বুলডোজার। আত্মসম্মান এত পাতলা নাকি? যাদের ধন-দৌলত-টাকা-পয়সা থাকেনা তাদের আত্মসম্মান খুব মজবুত হয়। আর যাদের এই সব থাকে তাদের আত্মসম্মান থাকে না বললেই চলে। সবার সব কিছু থাকেনা। বুলডোজার ভেঙ্গে যাওয়ায় রবিনকে বিকল্প চিন্তা করতে হল। প্রতিদিন ভ্যানে চড়ে এসে কলেজ করা অসম্ভব, অনেক খরচ। থানা সদরে বাসা ভাড়া করে থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। আরও বেশী খরচ। কিছু একটাতো করতেই হবে। কলেজে একটা হোস্টেল আছে বটে কিন্তু সেটাতো ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রদের জন্যে, ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা সেখানে সিট পাবে না। কিন্তু রবিনকে সেখানে উঠতেই হবে, বাই হুক অর বাই ক্রুক। কলেজ সংসদের ভিপির পিছু লাগল রবিন। টানা এক সপ্তাহ পিছ পিছ ঘুরে এবং দলের জন্যে "প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার" প্রতিজ্ঞায় হোস্টেলের এক রুমের ফ্লোরে সিট পেল রবিন।

শুরু হল রবিনের রাজনৈতিক জীবন। নিজের ফিগারের এবং সাহসের গুণে অল্প দিনেই রবিন হয়ে গেল 'রবিন ভাই'। ভিপির ওয়ালথার পি৯৯ সেমি অটোমেটিক পিস্তলটা এখন প্রায়ই রবিন ভাইয়ের কোমড়ে গোঁজা থাকে। এই জিনিস কাছে থাকলে শরীরটা কেমল হালকা হয়ে যায়, ভাসতে থাকে, চিৎকার করে অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করে। এই জিনিসের একটা গন্ধ আছে। মেয়েদের শরীরের মত, খুব টানে। ভিপির বাইকটাও মাঝে মাঝে পায় রবিন ভাই।

যে মেয়ে–সহপাঠীরা একদিন তার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল আজ তারাই তাকে যমের মত ভয় পায়। একদিন কলেজগেটে মোটর সাইকেলের উপর বসেছিল রবিন-

ওই সোনিয়া, এত দূরে দূরে থাকিস ক্যান? চিনিস–ই–না মনে হয়!

না মানে, রবিন ভাই, পড়াশুনা নিয়ে একটু ব্যস্ত। তাই-

আর পড়াশুনা! চল কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি। ওঠ বাইকে।

রহমত স্যারের একটা জরুরী ক্লাস ছিল ভাই। না গেলে-

আরে ঐ রহমত মিয়ারে আমি কইয়া দিবো, তুই ওঠ। আর আপনি–আপনি করছিস কেন?

ততক্ষণে সোনিয়ার হার্ট বানরের মত লাফাতে শুরু করেছে। 'না' বলার যে প্রিপারেশন সে নিয়েছিল, দ্রুত হার্টবিটের ধাক্কায় সেই 'না' শব্দটা তার মুখের মধ্যেই আটকে গেল। সেখানেই তার সমাধি। মুখের লালার সাগরে সলিল সমাধি। হিপনোটাইজড মানুষের মত সোনিয়া রবিনের বাইকের পিছনে ওঠে। ভ্রুম-ম-ম-ম প্রথমে ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটা চক্কর দেয় রবিন তারপর সোজা রওনা দেয় নদীর পাড়ের দিকে। বাইকের পিছনে সোনিয়া তাদের দুজনের মধ্যকার 'সম্পর্ক নিরূপক' দূরত্ব বজায় রেখেই বসেছে। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই রবিন যখন কষে ব্রেক করছে তখন আর সেই দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ওরা কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়ার পড়ই শুরু হয়ে গেল কানাঘুষা, বিশেষ করে মেয়েরা-

কিরে রবিন কি এই–সব–ও শুরু করে দিল নাকি? সোনিয়াই কি প্রথম, নাকি আরো অনেককেই খেয়েছে?

সোনিয়া কি শেষ পর্যন্ত রবিনের প্রেমে পড়ল? এই রকম মাস্তান একটা ছেলের সাথে?

ও! তলে তলে এতদূর!

নদীর পাড়টা খুবই সুন্দর, সবুজ ঘাঁসে মোড়া। সাধারণত এই টাউনের কোন বাড়িতে কোন মেহমান বেড়াতে এলে বিকাল বেলায় তাদের এইখানে বেড়াতে নিয়ে আসে বাড়ির লোকজন। অন্য সময় গরু-ছাগল চড়ে। একটা তাল গাছের ছায়ায় বসল সোনিয়া-রবিন। ৫/৭ মিনিট নিতান্ই অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে কথা বলতে না বলতেই রবিনের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। রবিন কার সঙ্গে কথা বলল তা সোনিয়া বুঝল না, কিন্তু সে গুণে রেখেছে, রবিন মোট ৪৩ বার 'ভাই' শব্দটা উচ্চারণ করেছে। 'ভাই' শব্দটা গোনার উদ্দেশ্য হল, রবিন ঠিক কোন বিষয়ে কথা বলছে এবং সেটা কোনভাবে সোনিয়ার জন্যে ক্ষতিকর কিনা তা বোঝা। কিন্তু সোনিয়া বুঝল ফোনের আলাপ তার সম্পর্কে নয়, অন্য কিছু।

"চল তোকে ক্যাম্পাসে আগায় দিয়ে আসি। আমার অন্য একটা কাজ পড়ছে।" ঠিক কি কারণে সোনিয়াকে এখানে এনেছিল রবিন, তা সোনিয়া বুঝতে পারল না। এমনকি রবিনের চেহারায় 'কোনকিছু প্রকাশ না করতে পারার অতৃপ্তি'ও নেই। বরং এই মুহুর্তে সে অন্য কিছু ভাবছে। ফেরার পথে রবিন একবারও ব্রেক কষল না। বেশ রিস্কে, বেশ দ্রুত বাইক চালাচ্ছে। শক্ত করে পিছনের ক্যারিয়ার ধরে রেখেছে সোনিয়া। 'সম্পর্ক নিরূপক' দুরুত্বটা এখন আগের চেয়েও বেশী।

এভাবে তিন বছর পেরিয়ে গেল। কোন রকম পড়াশুনা ছাড়াই এইচএসসিতে রবিন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল। সে শুধু পরীক্ষার হলে অ্যাটেন করত, উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রতিদিন তার খাতা পাল্টে যেত, এভাবেই এই ফলাফল। রবিন এখন কলেজের ভিপি। একবার শাকিব খানের একটা পোস্টারে সে দেখল শাকিব খান একটা লাল হুডওয়ালা পুলওভার পড়ে আছে। খুবই পছন্দ হল তার। পরের মাসে ঢাকায় গিয়ে ঠিক ঐ রকম একটা হুডি কিনল রবিন। তারপর সেই হুডি পড়ে পার করল আরও ২ বছর। লোকজন সামনে তাকে বলে রবিন ভাই আর আড়ালে আবডালে বলে রবিন হুডি। নিজেও নিজেকে রবিন হুড ভাবে সে। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-দালালি থেকে যে বিপুল অংকের টাকা আয় হয় তার বেশির ভাগই সে বিলিয়ে দেয় গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষদের মাঝে। অসহায়-দরিদ্র মানুষ রবিন ভাই বলতে অজ্ঞান। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার শেষ আশ্রয় স্থল রবিন হুডি, অসুস্থ রোগীর শেষ আশ্রয়স্থল রবিন হুডি, রেজিস্ট্রেশনের টাকা না থাকা মেধাবী ছাত্রের বাবার শেষ গন্ব্য রবিন হুডি। এই এলাকায় রবিন হুডি ঈশ্বরের চেয়েও বেশী জনপ্রিয়।

উৎসাহিত হয়ে রবিন হুডি চাঁদার পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। বাড়তি টাকায় বাড়তি সমাজ সেবা, বাড়তি নাম-ডাক। হুডির জনপ্রিয়তা এলাকার "রাজধানী প্রবাসী" এমপি সাহেবের কানেও পৌছায়। সেই উপজেলা চেয়ারম্যানও এ বছর নমিনেশন চাইবে জাতীয় সংসদ ইলেকশনে, কাজেই হুডিকে হাত করা ছাড়া এমপি সাহেবের আর কোন উপায় নেই। গোপনে হুডিকে ঢাকায় ডেকে পাঠায় এমপি সাহেব। এমপি সাহেবের ফ্লাটে গিয়ে হুডির মাথা ঘুরে যায়। এত চাকচিক্য- এত আভিজাত্য- এত ঐশ্বর্য্য।

"শোন রবিন, তুমি আমার ভাইয়ের মত। আমার এলাকার মানুষ তোমার প্রশংসায় পাগল। এটা আমার জন্যেও গর্বের। আমিতো সেদিন সংসদেই তোমার

কথা বললাম। ম্যাডাম পর্যন্ত তোমার কথা শুনে অবাক হল। আমি ম্যাডামকে বলেছি, তোমাকে উপজেলা চেয়ারম্যান বানাতে চাই। ম্যাডাম রাজি। আরে, আমরাতো সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যেই পলিটিক্স করি। যে গরিবের বন্ধু সে আমাদেরও বন্ধু।" চাকচিক্য-আভিজাত্য-ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ রবিনের কাছে এমপি'র বাণী দৈব্যবানীর চেয়েও দামী মনে হয়। ঠোট নড়ল বটে কিন্তু কি বলল বোঝা গেল না। শুধু দেখা গেল হুডির মাথাটা ডানদিকে বাক নিয়ে ডান কাধ ছোয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পারছে না। না পারুক, যতটুকু ডানদিকে টার্ণ নিয়েছে এমপি সাহেব তাতেই খুশি। তারপর আরও কিছু গায়েবী বাণী নিয়ে হুডি ফিরে এল গ্রামে। এই বাণীতে মানব জাতির কতটা কল্যাণ হবে তা অনিশ্চিত হলেও আমাদের রবিন হুড যে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসতে যাচ্ছে তা নিশ্চিত, কিং জনের খবর আছে। অবশ্য গায়েবী পরিকল্পনা যদি সফল হয়! রবিন হুডরা কি কখনও সিংহাসনে বসতে পারে? না, রবিন হুডরা বিপ্লবী, সিংহাসনে বসলে তারাও কিং জন হয়ে যায়। কাজেই অধিকাংশ সময় রবিন হুডরা সিংহাসনে বসতে চাইলে প্রকৃতি তাদের মেরে ফেলে। প্রকৃতির দরকার আইডল, সব পক্ষেরই আইডল দরকার, কিং জন ও দরকার, রবিন হুড ও দরকার।

কিছুদিন পর একটা মিষ্টির প্যাকেটে করে তিনটা আর্জেস গ্রেনেড এল হুডির কাছে। সুযোগ বুঝে উপজেলা চেয়ারম্যানের উপর ছুড়ে মারতে হবে। তারপর সোজা চাকচিক্য-আভিজাত্য-ঐশ্বর্য্য। মাইক্রোবাস রেডিই আছে। শুক্রবার সকালে মটর বাইকে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন চেয়ারম্যান। একটা মাইক্রো তাকে ক্রস করার সময় ছুড়ে মারে একটা গ্রেনেড। ব্যাস সব শেষ। লোকজন জড়ো হওয়ার আগেই মাইক্রো গায়েব। কিন্তু হুডির কপাল খারাপ। বাকি দুটি গ্রেনেড তার কাছেই ছিল। পথে ধরা পড়ল রবিন হুডি, পুলিশের কাছে। এমপি সাহেবের আর সাথে আর যোগাযোগ করতে পারল না রবিন।

দরিদ্র বাবা-মা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন রবিনকে জামিনে মুক্ত করতে। পারলেন না। রবিন তখন তার বাবা-মাকে বলল, এতদিন যাদের সে উপকার করেছে, সেই গ্রামবাসীকে নিয়ে একটা মিছিল বের করতে পারলে রাজনৈতিক প্রভাবে জামিন করানো যাবে।

রবিনের মা-বাবা ছুটে গেল সেই সব মানুষের কাছে এতদিন যারা হুডিকে ঈশ্বরের চেয়েও মহান ভাবত, হুডির দয়া-দাক্ষিণ্যে যাদের জীবন চলত, যারা হুডিকে প্রাণ ভরে আশির্বাদ দিত। কিন্তু হায় প্রকৃতি বড়ই বেঈমান। রবিনের

বিপদে আজ কেউ তাকে চেনে না। অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হল বাবা-মা। একেক জন একেক কথা বলে এড়িয়ে গেল-

দেখ বাপু এই সব পলিটিক্সে জড়ায়ে আবার কোন বিপদ ডেকে আনি!

এই সব মিছিল টিছিল করে লাভ নেই, এমপি সাহেবের পা ধর গিয়ে।

এই জন্যেই গরিব মাইনষের পলিটিক্সে যাইবার নাই। কি দরকার আছিল।

আহারে বেচারা আমাদের কত উপকারটাই না করেছিল। কিন্তু কি করব বল, জমির মামলাটা নিয়ে এত ব্যস্ত, নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না।

উপায় না দেখে বাবা-মা এমপি সাহেবের কাছে গেল। কিন্তু গ্রুপ ফোর্সের দাড়োয়ান তাদের ভিতরে ঢুকতে দিল না। যাক! প্রকৃতির ভান্ডারে আরও একটা আইডল যোগ হল।

উসাইন বোল্ট

গাছের ডালের মত বড় একটা রাস্তা থেকে যেখানে মাঝারি একটা রাস্তার জন্ম হয়েছিল; সেই মোড়ে দাঁড়িয়েছিল উসাইন বোল্ট। চেহারায় ঘুম আর জাগরণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। কখনও ঘুম প্রাধান্য বিস্তার করছে কখনও জাগরণ। আর সেই সাথে প্রতীক্ষা। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বড় সাইজের হলুদ রঙের বাস মোড় ঘুরেই বোল্টকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল প্রায় ৫০ ফুট। ঘটনাটা ঘুমের মাথায় 'টং' করে একটা বাড়ি মারল। মুহূর্তে জাগরণ তার শক্তি প্রকাশ করল এবং কোন প্রকার বন্দুক ফোটার আওয়াজ ছাড়াই উসাইন বোল্ট দৌড় শুরু করল। দৌড়.. একি! উসাইন বোল্ট বাসের পিছনে ছুটছে কেন?

নাকি সে উসাইন বোল্ট নয়, উসমান বাবু? তার দেশ তো মনে হচ্ছে জামালপুর, জ্যামাইকা নয়। তার আসল নাম উসমান গনি বাবু। হাল-ফ্যাশন হল দুই শব্দের নাম, তাই 'গনি' বেচারা আত্মগোপন করে উসমান বাবুর ইজ্জত রক্ষা করেছে। কিন্তু জামালপুরের উসমান বাবু এত দ্রুত দৌড়ানো শিখল কোথায়? বাবুর বাবা নিম্ন পদের সরকারী কর্মচারী, আর মা সারা জীবন সেলাই মেশিনের 'ঘটর ঘটর' ছাড়া অন্য যে কাজটা করেছে তা হল, বাবুকে পড়ার টেবিল থেকে উঠতে দেয়নি। খেলাধুলা প্রথম প্রথম সে করত স্বপ্নে, পরেতো স্বপ্ন থেকেও হারিয়ে গিয়েছিল। সেই উসমান বাবু এত দ্রুত দৌড়াচ্ছে? বিশ্বাসই হচ্ছে না। নাকি ও উসাইন বোল্টই। আমি কি ভুল দেখছি? একই রকম দৌড়!

উসমান বাবুর অচেনা ফেসবুক ফ্রেন্ড মেহজাবিন কাজি, একবার তার সাথে চ্যাট করার সময় মেহজাবিন বাবুকে বলেছিল-

–আমি আপনাকে সেদিন দেখলাম।

–কোথায়?

–ঐ যে রাস্তার মোড়ে, বাসে উঠছিলেন।

–ওহ্ হো, আমি তো তাহলে সেদিন আমার এক বন্ধুকে মিস করলাম।

–কাকে?

–আপনাকে! আপনি আমাকে দেখলেন আর আমি আপনাকে দেখতে পারলাম না।

এরপর চ্যাটের আলোচনা অবশ্য অন্য দিকে টার্ন নিয়েছিল। কিন্তু সেই কথা মনে পড়ায় উসমানের পা দুটো একটু দ্বিধায় পড়ে যায়, ছন্দ পতনে গতি হ্রাস পায়। মেহজাবিনের মত তার কোন ফেসবুক ফ্রেন্ড কি তার এই দৌড় দেখছে? তাহলে তো ইজ্জত আর থাকবে না। তার কি এভাবে দৌড়ানো উচিৎ হচ্ছে? কিন্তু এই বাসটা মিস্ হলে ৯টার মধ্যে অফিসে পৌছানো যাবে না, একদিনের বেতন কাটা যাবে। না এই বাসটা মিস্ করা যাবে না। উসমান বাবু উসাইন বোল্ট হয়ে ওঠে। দৌড়।

বাবুর বন্ধু নুপুর। একটা বেসরকারী টিভির অ্যাসিস্টেন্ট প্রোডিউসার। ট্রাফিক জ্যামের উপর একটা ডকুমেন্টারী শ্যুট করতে গিয়ে নুপুর দেখেছিল বাবু বাসের দরজায়, 'দরজার খোলা পাল্লার' মত ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে। শুধু যে নুপুর দেখেছিল তাই নয় ক্যামেরায়ও রেকর্ড হয়েছিল। এডিটিং এর সময় নুপুর ইচ্ছা করে ফুটেজটা ফেলে দিয়েছিল। বন্ধুর ঝুলন্ত ছবি টিভিতে গেলে বন্ধু মাইন্ড করতে পারে, তাই। গল্পটা আবার ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নুপুর বাবুকে বলছিল, আর সেই সাথে সাবধানে পথ চলার উপদেশ। জবাবে অবশ্য বাবু "আরে এটা কোন বিষয় না, কত জনেইতো বাসে ঝোলে" বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন হঠাৎ করে মনে হল, এই মুহূর্তে কি কোন টিভি ক্যামেরা তাকে তাক করে রেখেছে? কাল স্যাটেলাইটে ট্রাফিক জ্যামের নিউজে তার দৌড় প্রচারিত হবে? তারপর কি? অসংখ্য ফোন আর ফেসবুক ওয়ালে কমেন্ট? এভাবে কি দৌড়ানো ঠিক হচ্ছে? ইস্ বাসটা তো প্রায় ভরেই গেল। ওঠা যাবে তো?

স্থিতি জড়তায় আবদ্ধ মধ্যবিত্ত শরীর থেমে যেতে চায়। আর মুদ্রাস্ফীতিতে কাতর নিম্নবিত্ত মন দৌড়াতে চায়। একেই কি বলে ক্লাস কনফ্লিক্ট? বিত্ত নিয়ে ভালোই বিপদে পড়েছে উসমান। কার্ল মার্কস্‌কে একটা ফোন দেয়া দরকার। মার্কস ভালো বলতে পারবে। আচ্ছা মার্কসের মোবাইলের ওয়েলকাম টিউনে কোন গানটা থাকতে পারে? "জাগো জাগো জাগো সর্বহারা.." নাকি "এই পতাকা শ্রমিকের রক্ত পতাকা.."

আর ক্লাস সেভেনের ছেলেদের সাথে ক্লাস এইটের ছেলেদের যে কনফ্লিক্ট, ওটাওতো ক্লাস কনফ্লিক্ট। তাই না?

কার্ল মার্কস্ নিয়ে মজার কথা ভাবতে ভাবতে বাবু তার 'বা' হাত দিয়ে বাসের দরজার লোহার রডটা ধরে ফেলে। 'ডান' পায়ের পাতার সামনের অর্ধেকটা তুলে দেয় বাসের পা-দানির শেষ খালি জায়গাটুকুতে, সেই সাথে মুখজোড়া বিজয়ের হাসি। আর ঠিক তখনই বোল্টের বুক ছিড়ে ফেললো সিল্কের ফিতাটা। তার নিজের মত করেই উদযাপন করল বিজয়টা। দর্শকদের সামনে 'বা' হাতটা ৪৫° কোণে উচু করে, হাতের আঙ্গুল বরাবর তাকিয়ে এবং 'ডান' হাতটা বুক বরাবর 'বা' হাতটাকে অনুসরণ করে বোল্ট তার 'লাইটেনিং বোল্ট' প্রতীকটা দেখালো দর্শকদের। যথারীতি শরীরের অধিকাংশ ভর ডান পায়ের উপর।

আশ্চর্য্য! বাবু যেভাবে বাসের দরজায় রডটা ধরে ঝুলে আছে সেটাও বোল্টের সেই 'লাইটেনিং বোল্ট' বিজয় চিহ্নের মতই। জ্যামাইকার উসাইন বোল্টের সাথে আমাদের জামালপুরের উসমান বাবুর কত মিল!

বড়শি কন্যা

মাঝারি সাইজের একটা পুকুর। টলটলে পানি। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে অতি আধুনিক বড় শহর, নিউ ইয়র্কের মত। পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র গ্রাম। উত্তরে পাহাড়ী এলাকা আর দক্ষিণে সাগর। পুকুরে অনেক মাছ। পুকুরের পাড়গুলোতে তাই বড়শি কন্যাদের ব্যাপক আনাগোনা। সবাই বড়শি কন্যা নয়, কেউ কেউ আসে খালি হাতে, কেউ কেউ কারেন্ট জাল হাতে। তবে বড়শি কন্যাই বেশী। আচ্ছা, খালি হাতে কেন আসে? খালি হাতে-কি মাছ ধরা যায়? যারা খালি হাতে আসে মাছ-কি পানি থেকে লাফ দিয়ে উঠে হেটে হেটে ওদের সাথে চলে যায়? হু, যায়! প্রকৃতি বড়ই রহস্যময়! আর যারা কারেন্ট জাল নিয়ে আসে, একসাথে অনেক মাছ ধরতে? ওরা আসলে বোকা। বেশী খাই-খাই করা ভালো না। আর তাছাড়া এত মাছ একসাথে মেইনটেইন করা–ও–তো টাফ। আবার অন্যরাও এই জালওয়ালীদের ব্যাপক গালমন্দ করে। এসব কারণে জালওয়ালীদের সংখ্যা খুবই কম। বড়শি কন্যাই বেশী। বিচিত্র সব মাছ কিলবিল করছে পুকুরে। কেউ রেমন্ডের স্যুট-টাই পড়া, কারো শ্যাম্পু করা লম্বা চুল-দাড়ি-গোঁফ, কারো আবার চকচকে চেহারা, বড় ভূড়ির উপর বেল্ট দিয়ে প্যান্ট বেধে রাখা। এই মাছগুলিকেই সবাই ধরতে চায়। আবার কিছু চালচুলোহীন মাছও আছে। যাদের কেউ ধরতে চায় না। বরং কারো বড়শিতে এই মাছগুলো গাঁথলে বড়শি কন্যাদের মন খারাপ হয়। বড়শি কন্যারা যে যার সাধ্যমত ভালো ভালো আকর্ষণীয় আদার গেঁথে দেয় বড়শীতে। সেই আদার খেতে এসে ধরা পড়ে মাছগুলো। সাধারণত যার আদার যত আকর্ষণীয় তার বড়শীতেই সবচেয়ে দামী মাছ ধরা পড়ে। তবে টেকনিকেরও ব্যাপার আছে। ভালো টেকনিক জানলে কম আকর্ষণীয় আদার দিয়েও দামী মাছ ধরা যায়। বড়শী কন্যারা টসটসে ঠোট, খাড়া বুক, চকচকে উরু, গোলগাল নিতম্ব, যোনী নিয়ে আসে আদার হিসেবে।

পুকুরের পশ্চিমপাড়ে যেসব বড়শী কন্যারা বসেছিল তাদের একজন মার্গারেট। সকাল থেকে আকর্ষণীয় আদার গেঁথে বসে আছে মার্গারেট কিন্তু একটাও মাছ ধরতে পারেনি। অথচ এক কালে পশ্চিম পাড়ের বড়শী কন্যাদের ব্যাপক দাপট

ছিল। পুকুরের সব মাছ পশ্চিম পাড় ঘেঁষে ঘুরঘুর করত। দিনবদলের ঝড়ের হাত থেকে মেরেলিন মনরোর গাউনটা হয়তো রক্ষা করা গেছে। দেয়ালে ঝুলন্ত মনরো দুই হাতে গাাউনটা চেপে ধরে পশ্চিম পাড়ের ইতিহাস হয়তো মনে করিয়ে দিচ্ছে কিন্তু পুকুর পাড়ে সেই দাপট আর তাদের দখলে নেই। মার্গারেট তাই হা করে তাকিয়ে থাকে পূর্ব পাড়ের ময়নার দিকে। সকাল বেলায় মার্গারেটের 'টসটসে ঠোটের' আদারটা চুরিকরে খেয়ে পালিয়েছে একটা কর্পোরেট মাছ। আর ময়না দুপুর ১২টায় ঘুম থেকে উঠেছিল। তারপর মাত্র ১ কাপ কফি খেয়ে কানিজ আলমাসের কাছে ফেসিয়াল করে তারপর গেল পুকুর পাড়ে। আদার ফেলতে না ফেলতেই একটা ইঞ্জিনিয়ার মাছ ধরে ফেলল ময়না। বিজয়ীর মত চারপাশটা একবার দেখে নিল সে। বিজয়ের আনন্দ তার সারা শরীরে ফুটে উঠল। বিস্মিত মার্গারেট করুণ সুরে ময়নাকে প্রশ্ন করল, "তোরা এত সহজে কিভাবে পারিস? ঠোটটা খেয়ে পালিয়েছে একটা, এখন বুক দিলাম। তবুতো হচ্ছে না!" "শুধু আকর্ষণীয় আদার হলেই হবে না, ট্রিক্সও জানতে হবে। চোখের পানি, নাকের পানি কাজে লাগা।" ইঞ্জিনিয়ার মাছ নিয়ে চলে যাবার পথে ময়না এই বুদ্ধিই দিয়ে গেল মার্গারেটকে। কিন্তু এই বুদ্ধি মার্গারেট কিভাবে ব্যবহার করবে, তাই বুঝছে না। চোখের পানি, নাকের পানি দিয়ে কিভাবে মাছ ধরে?

উত্তর পাড়ের মাথাই এবং দক্ষিণ পাড়ের মংপং। তারা এই মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় প্লেট রাউন্ডের চ্যাম্পিয়ন আর রানারআপ। তারাও চায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-ক্রিয়েটিভ মাছ ধরতে, কিন্তু পারে না। তবে কিছু মাছ আছে যেগুলি তাদের বড়শির আশপাশে ঘুরঘুর করে। মাথাই-মংপংরা সহজেই তাদের ধরে নেয়। কালো–মাথা মোটা–গাবর টাইপের কিছু মাছ আছে এরা মাথাই-এর বড়শীতে বিধার জন্যে ধান্দায় থাকে আর নাক বোচা-খাটো-ফর্সা মাছগুলি মংপং এর জন্যে। এই মাছগুলি ধরতে তেমন আদারও লাগে না। তবে দামি মাছদের মধ্যে মাখাই এর কদর দিন দিন বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

মাছ গুলিও কম চালাক নয়! বোকাসোকা বড়শী কন্যা পেলে আদার খেয়ে পালায়! আবার বেশী চালাকি করতে গিয়ে কোন কোন মাছ আদার ছাড়াই ধরা পড়ে যায়। মাছ–বড়শী কন্যা, চালাকি–চালাকি খেলা।

মার্গারেট যতক্ষণ চোখের পানি, নাকের পানি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ততক্ষণে তার 'বুকটা' খেয়ে পালিয়েছে একটা ক্রিয়েটিভ মাছ। কয়েক বছর আগেও এই ক্রিয়েটিভ মাছগুলোর কোন দামই ছিল না। কেউ ধরতে চাইতো না। কিন্তু এখন তাদের ব্যাপক ডিমান্ড। বড়শি খালি দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মার্গারেট। ময়না যেখানে বসেছিল সেখানে এসে বসল মহুয়া। সেও কানিজ আলমাসের কাছ থেকে ঘুরে এসেছে। ময়নার কাছ থেকে 'চোখের পানি' থিউরী

শিখে এসেছে। গতকাল তার 'ঠোটটা' খোয়া গেছে। আজ প্রথমে সে 'বুক' দেবে তারপর প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে, উরু-নিতম্ব-যোনী। একটা পাজেরোওয়ালা ব্যবসায়ী মাছ তাকে ধরতেই হবে। মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে মহুয়া বলে "মার্গা, এভাবে হবে না। ময়না'দির কাছ থেকে কোচিং নিয়ে আয়। উনি অনেক ট্রিক্স জানে। শিখে আয়, তখন দেখবি মাছ ধরা কত সহজ!" উত্তর পাড় থেকে মাথাই বলে "আমরাও কি শিখতে পারব?" "অবশ্যই" মহুয়া উত্তর দেয়। সে আরও বলে "তুই আর মংপং গিয়েও শিখে নিস। আজকাল আর কোন বোকা মাছ নেইরে। সব শালাই চালাক। দেখবি দু'দিন পর তোদেরও কাজে লাগছে।" মাথাই আর মংপং একে অন্যের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ পর মহুয়া একটা পাজেরোওয়ালা ব্যবসায়ী মাছ ধরে ফেলে। মার্গারেট আর আদার না দিয়ে ময়নার খোঁজে বের হয়।

ছবিওয়ালা ও হাটুরে

আজ বুধবার। হিজলা গ্রামের হাটবার। সপ্তাহের এই একদিনই হাট বসে এখানে। সরু মাটির রাস্তার দুই পাশে দোকান-পাট। পিয়াজ-রসুন-তেল-লুন সবই ওঠে। ছোট্ট গ্রাম। দোকানী-হাটুরে সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আজ একজন আগন্তুক এসেছে। কেউ তাকে চেনে না। অদ্ভূত পোষাক। প্যান্ট শার্ট ইন করা। পায়ে স্নিকার্স। মাথায় হ্যাট। একটি মোটা গাছের গোড়ায় শিকড়ের উপর চুপচাপ বসে আছে সে। আর গাছের কান্ডে পেরেক ঠুকে তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে বড় এক টুকরা সাদা কাগজ। সাদা কাগজটির ঠিক মাঝখানে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে আঁকা একটি ছোট্ট পাখি।

হাট যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানে বসেছে এই অদ্ভূত ছবিওয়ালা। এই জন্যে মনে হচ্ছে সেও হাটেরই একজন দোকানী। সবাই-ই কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই আগন্তুকের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কেউই কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। নিরবতা ভাংলেন এক বৃদ্ধ-

কে ভাই আপনি? এখানে কি চান?

আমি একজন ছবিওয়ালা। ছবি বিক্রি করতে এসেছি।

এই ছবি? এই পাখির ছবি?

জ্বি।

ও!! তো দাম কত এই পাখির ছবির?

এক লাখ টাকা।

কত? কত বললেন?

জ্বি, এক লাখ টাকা।

ক্ষেপে গেলেন বৃদ্ধ। সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন। বললেন, "এই শুনেছ, শুনেছ তোমরা, কি বলে এই লোক। তার এই ছবির দাম নাকি এক লাখ টাকা। তাও আবার বিক্রি করতে এসেছে এই গ্রামের হাটে। দেখ, তোমরা তাকিয়ে দেখ। দেখ কেউ কিনতে চাও কিনা এই মহামূল্যবান ছবি। আমাকে ফাও দিলেও নেব না।" বলে গজ গজ করতে করতে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

জমাট বরফের মত আগন্তুক ছবিওয়ালাকে ঘিরে ভীড় জমে থাকল কিছুক্ষণ। অধিকাংশই চুপচাপ। দু'একজন ফিসফাস করছে। কিছুক্ষণ পর বরফ গলতে শুরু করল। ভীড় আস্তে আস্তে পাতলা হচ্ছে। যে যার কাজে লেগে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল এই কথা। কিন্তু কেউ আর সাহস করছে না আগন্তুকের সাথে কথা বলতে।

২ ঘন্টা পর আগন্তুকের সামনে মাত্র ১ জন দাড়ান। ২৫ বছর বয়সী গ্রামের শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুন রাসেল। সে প্রশ্ন করল আগন্তুককে-

তো ভাই, আপনার এই ছবির এত দাম কেন?

এই হলাম আমি। (ছবিওয়ালা পাখিটার উপর আঙ্গুল রাখল) এইটা আমার ছবি। ভেবেছিলাম সারাজীবন আগলে রাখব এই ছবিটা। কিন্তু অভাবে পড়ে বেচতে হচ্ছে। আমি আমাকে বেচতে চাচ্ছি। একজন শিল্পীর দাম কি ১ লাখ টাকা হতে পারে না?

কিন্তু এই গ্রামে কে কিনবে আপনার এই ছবি? তার চেয়ে বরং আপনি শহরে যান। সেখানে হয়তো কাউকে খুঁজে পাবেন টাকাওয়ালা।

আমি তো আমাকে একজন শহুরের হাতে তুলে দিতে পারি না। দিলে গ্রাম্য কারো হাতেই তুলে দেব।

কিন্তু এই গ্রামে আপনি এই ছবি কেনার মত কাউকেই পাবেন না।

পাব পাব। ঠিকই একদিন পাব।

এরপর থেকে প্রতি বুধবার এই ছবিওয়ালা ঐ গাছতলায় এসে বসে। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসে তাকে দেখতে। সপ্তাহের বাকি ৬ দিন সে কোথায় থাকে কেউ জানে না। সবাই জানে তার গল্প। কেউ তাকে প্রশ্ন করে না। শুধু গোল হয়ে দাড়িয়ে চুপচাপ থাকে নয়তো ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

২১শে ফেব্রুয়ারী

লনী ভ্যানেটি ব্যাগটা খুলে আবারও টাকাটা গুনল, ৫টা কচকচে এক হাজার টাকার নোট, মোট পাঁচ হাজার টাকা। একটা ভালো উপহার কেনার জন্যে যথেষ্ট, কিংবা লাগলে এটিএম বুথ থেকে আরো তোলা যাবে। এমন কিছু কেনা যায় যা অপুর প্রতিদিন প্রয়োজন বা এমন কিছ, যা প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু পছন্দের। কিন্তু কিছুই কিনতে ইচ্ছে করছে না। সে টাকা গুলি আবারও ব্যাগে ভরে রাখল। সকালে যখন বুথ থেকে টাকাগুলো তুলেছিল তখনও তার কিছুই কিনতে ইচ্ছে হয়নি, এখনও হল না। অসুবিধা নেই, বিকালে বা সন্ধ্যায় যদি কিনতে ইচ্ছে হয় মার্কেটে গিয়েই কিনে আনা যাবে। ব্যাগটা বিছানার উপর ছুড়ে মেরে লনী সোফার উপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, "ধ্যাৎ, একটা পেইন।" তারপর রিমোট চেপে 'নাইন এক্স এম' চ্যানেল অন করে 'ভিগি বিল্লির' গান শুনল তারপর 'এমটিভি' তারপর 'ইসলামিক টিভি' তারপর 'বিবিসি' তারপর পরপর দু-তিনটা টক শো তারপর 'সুইচ অফ'।

লনীর মনে আছে, প্রথম এনিভার্সারিতে সে তিনটা আন্ডার অয়ারের একটা প্যাকেট গিফট করেছিল; এমন কিছু যা সারাক্ষণ অপুর শরীর আকড়ে থাকবে। তাই নিয়ে কত মজাই না করেছিল ওরা, কত হাসি-ঠাট্টা। কিন্তু মজার স্মৃতি মনে পড়ায় মোটেও মজা পায়নি লনী। তারপরের বছর একটা শার্ট। আর এবার...

তারিখ দেখার জন্যে নয়, এমনিতেই ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালো লনী। তার মনে পড়ছে ছোটবেলা থেকে সে যত ক্যালেন্ডার দেখেছে সব ক্যালেন্ডারেই ফেব্রুয়ারী মাসের পাতায় লাল পলাশ ফুলের ছবি। সত্যিই কি সব ক্যালেন্ডারে পলাশ ফুলের ছবি ছিল, নাকি এই মুহুর্তে তার অন্য কোন ছবির কথা মনে পড়ছে না? হতে পারে। আর একবার মনে হল ব্যাগটা হাতে নিতে কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হল না। লনী শুয়ে রইল সোফার উপর, যতক্ষণ না এসএমএস টা আসল। এসএমএস টা আসল রাত ৮টা ৩ মিনিটে, "নট কামিং টু নাইট, সি ইউ টুমরো"। লনী প্রায় ১ মিনিট ধরে এসএমএস টা পড়ল এবং তারপর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল, এখনও সেই পলাশ ফুল। ২১ তারিখটা লাল রং করা। ভালো। তারপর ফ্রিজটা খুলে একটা পেয়ারা বের করে খেল। তারপর শাম্মিকে ফোন করল-

"হ্যাপি এনিভার্সারি, দোস্ত।"

"তুই কোথায়?"

"বাসায় যাচ্ছি..."

"তোর ওখানে আজ রাতটা থাকা যাবে?"

"হা হা হা... যাবে কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

"কি?"

"আসার পথে রূপায়ন সেন্টারের গেটে যে দাড়োয়ান দাড়ানো থাকবে তার হাতে একশ টাকা দিবি, তারপর সে তোকে যা দেবে তাই নিয়ে চলে আসবি।"

"কি দেবে?"

"সেটা তোর জানার দরকার নেই।"

"ওকে"

"বাই"

সুন্দর একটা লাল শাড়ি পড়ে প্রায় আধাঘণ্টা ধরে সেজেগুজে লনী বের হল। একটা রিক্সা নিয়ে রূপায়ন সেন্টারের গেটে গিয়ে দাড়োয়ানের হাতে ১টা ১০০ টাকার নোট তুলে দিল। দাড়োয়ান বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লনীর দিকে তাকালো। লনীও তার চোখের দিকে তাকাল। এক-দুই-তিন সেকেন্ড, দাড়োয়ান চোখ নামিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজের খিলি বের করে লনীর হাতে দিল।

"আজ তোকে একটা মজার জিসিন খাওয়াবো"

"কি?"

"তুই যে জিনিসটা এনেছিস, ওটা তেলের মধ্যে দিয়ে তেল গরম করব।" শাম্মীর রুমের চারটা দেয়াল দেখে নিল লনী। নাহ্ কোন ক্যালেন্ডার নেই। একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল লনীর চোখে। সেই চোখ অনুসরণ করে শাম্মী বলে যাচ্ছে, "সেই তেল দিয়ে চকলেট কেক বানাবো। ব্যাস হয়ে গেল, খুবই সহজ রেসিপি।"

"ঐ কাগজের মধ্যে কি আছে?"

"গানজা, কেউ বলে 'সিদ্ধি', কেউ বলে 'গুরু', কেউ বলে 'শুকনা', কেউ বলে 'জি' আর বইয়ে লেখা 'মারিজুয়ানা'।"

"ধ্যাৎ এসব আমি খাইনা। এর চেয়ে আয় সারারাত গল্প করি"

"গল্প করার মত কিছু নেই। তুই আর আমি দুই ভূবনের বাসিন্দা। আমাদের গল্প মানে যারযার যুক্তি স্টাবলিশ করার চেষ্টা। আমি আর কোন যুক্তি শুনতে চাই না। আমি একটা যুক্তি মুক্ত জীবন চাই।"

শাম্মি একটা ফ্রাই প্যানে তেল ঢেলে নিল। "আই অ্যাম হ্যাপি উইথ মাই সেলফ। ওর চেয়ে আয় 'হ্যাসকেক' খাই। দেখবি মজা পাবি।"

শাম্মির থেকে চোখ সরিয়ে লনী টিভির দিকে চোখ দিল। শাম্মী একা থাকে। ১ রুম ১ বাথ ১ কিচেনের ফ্লাট। ও বিয়ে বা রিলেশনে বিশ্বাসী নয়। ওর কথা হল "এমনিতেই পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির অধিক উৎপাদন। আর বেশী উৎপাদন না করাই ভালো। আর প্রতিদিন একই লোকের সাথে ঘুমানো প্রাণী হিসেবে আমাদের জন্মগত স্বাধীনতার পরিপন্থী। লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে স্বেচ্ছায় পরাধীন হই কিভাবে? একটা হাঁস-মুরগীও তো প্রতিদিন একই জনের সাথে ঘুমায় না।" শাম্মী, অপু, লনী ইউনিভার্সিটির সময় থেকে ফ্রেন্ড।

"তোর জামাই কই?"

"কি জানি।"

শাম্মী আর এ বিষয়ে কোন কথা বাড়াল না। সে কেক বানাতে কিচেনে ঢুকল। লনী খুব ভালো করে টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, আলমারীর উপর দেখল। নাহ্ কোন ডেস্ক ক্যালেন্ডারও নেই।

"কই আলাদা কোন টেস্ট তো পাচ্ছি না।"

"দেড় ঘণ্টা পর টের পাবি। আর খাসনে। যা খাইছিস এটাই সামাল দিতে পারবি না।" শাম্মী বাকি কেকটুকু ফ্রিজে তুলে রাখে।

"দোস্ তোর সাহস কেমন? কম না বেশী।"

"আগে অনেক ছিল এখন কম।" লনী ভীত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে পার্কিংয়ে রাখা গাড়ি স্টার্ট দিতেই তার মেজাজ খারাপ হল। এখন কোথায় যাবে সে? বাসায়? ধ্যাৎ, ইচ্ছা করছে না। জ্যাম ঠেলে চৌরাস্তায় গিয়ে আর আগাতে ইচ্ছা করল না, ইউ টার্ন নিল। তারপর উল্টা পথে কিছুদূর গিয়ে আবার ইউটার্ন। জ্যাম থাকাতে ভালো হচ্ছে। অল্প দূরত্ব যেতেই অনেক সময় লাগছে। এখন অল্প দূরত্ব যেতে বেশী সময় লাগাই ভালো। আরো ভালো হত ঐ চৌরাস্তা পর্যন্ত যেতে যদি সারাজীবন কেটে যেত। "জীবন! বালের জীবন", ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা বাস হালকা ধাক্কা দিল তার গাড়িটিকে কিন্তু ইচ্ছা হলনা বের হয়ে গিয়ে বাসের ড্রাইভারকে একটা ধমক দিতে।

"বাসায় গিয়ে কি আর হবে! সেই একই বস্তা পচা কাহিনী। বালের জীবন।" চাইলে এই কথাগুলো সে মনে মনে ভাবতে পারত। কিন্তু একা একা শব্দ করে কথা বলার একটা মজা আছে। তখন 'মুখ' আর 'কান' কে দুইজন আলাদা মানুষ মনে

হয়। আর 'চোখ' হয় নিরপেক্ষ দর্শক। নিরপেক্ষ দর্শক তখন একটা নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে। "টুউট...টুউট...টুইট..." মোবাইলের কি-প্যাডের শব্দ।

"দোস্ হ্যালো, কই তুই?"

"অফিসে। কি খবর?"

"মাল খাবি? ওয়েস্টিনের বারে সেই রকম একটা ককটেল বানায়..."

"উউউ... ওকে তুই গিয়ে বয়। আমি আসছি উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার।" বলে রায়হান লাইন কেটে দেয়।

ওয়েস্টিন হোটেলের ২৩ তলায় বারে মুখোমুখি বসা অপু আর রায়হান। অ্যাবসুলেট ভদকা, স্কচ আর অরেঞ্জ জুসের ককটেল খাচ্ছে তারা। রায়হান কেবল ১ পেগের অর্ধেক শেষ করেছে আর অপুর চলছে ২য় টি।

"তাহলে কি ঠিক করলি, রাতে কোথায় থাকবি?"

"জানিনা।"

"আমার বাসায় স্টে-ওভার করতে পারিস।"

"ধ্যাৎ, ঐসব টিপিকাল জিনিস আর ভালো লাগে না।" ২য় পেগের শেষটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে অপু বলে, "একটা বালের জীবনের ফাঁদে আটকে গেছি। বেরও হতে পারছি না থাকতেও পারছি না।" কোনার টেবিলের এক বিদেশী মহিলার হাতের বিয়ারের ক্যান থেকে চোখ তুলে অপু আবার শুরু করে, "৭৩ নম্বর রোডের প্যারিস হাউজের নাম শুনেছিস?"

"হু"

"যাবি?"

"নাহ্।"

"কেন?"

"আমার জীবনটা এখনও বাল হয়ে যায়নিরে দোস্। এখনও বলের মত ঝুলছি। বাসায় যেতে হবে ..." রায়হান আরও কিছু বলছিল কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে অপু ঘাড় বাকিয়ে সিলিংয়ে ঝুলানো লাইটের দিকে তাকায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ততদিনে বেশ ছোট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু ছোট খাট মিছিল করা, দেয়ালে চিকা মারা আর লিফলেট বিতরণের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। তবু কিছু সৃষ্টিশীল মানুষ 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে' নয় বরং সমমনা মানুষদের কাছে থাকতে বাম ছাত্র সংগঠনে যোগ দেয়। মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা দেয়। সন্ধ্যার পরে ডাকসুর সামনে গান গায়। পলাশীর মোড়ে রাত জেগে তর্ক করে, চা খায়। গণতন্ত্র এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কার্যকর। এদেশে অসৎ ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে ভেজাল বিরোধী

অভিযানের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডেকে অভিযান বন্ধ করে দিতে পারে। রাজনৈতিক আলোচনায় হতাশ হয়ে লনী-শাম্মী-অপু-সাকিরা তাই মানবিক আলোচনার পথে পা বাড়ায়। মনের অলি গলি রাজপথের চেয়ে বেশী সম্ভাবনাময় মনে হয়। মনের অলিগলি ধরে হাটতে হাটতে এক সময় তারা রাজপথ ভুলে যায়। "সংগঠনের কর্মীদের মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ক সংগঠনের জন্যে ক্ষতিকর।" কিন্তু রাজপথ তো ট্রাফিক জ্যামে অবরুদ্ধ। আর তাছাড়া অলিগলি ছেড়ে কর্মীদের রাজপথে ডেকে নেবার মত নেতাই বা কোথায়? লনী-অপু রাতের পর রাত ক্যাম্পাসে হেটে হেটে, গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছে। ক্যাম্পাসের মধ্যে এই নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে সাহস করেনি। বিশেষ করে প্রতিবছর ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতটা কাটত তাদের আরও আনন্দে। সবার সাথে এক হয়ে শহীদ মিনারে-রাস্তায় আলপনা এঁকে, ফুল সাজিয়ে কখন যে সকাল হয়ে যেত বোঝাই যেত না। তিন বছর আগে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে হঠাৎ করেই অপু লনীকে বলল "চল আজ আমরা বিয়ে করে ফেলি।" লনী খিলখিল করে হেসে অপুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল "চল"। তারপর বন্ধু বান্ধব মিলে সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম সাহেবকে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে পড়াতে পড়াতে রাত ৪টা। নতুন জামাই বৌ 'কবুল' বলে খালি পায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়েছিল।

অপু সিলিংয়ে ঝুলানো লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে। আজও ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত। আজ তার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। একটা এসএমএস করল। "নট কামিং টু নাইট। সি ইউ টুমরো।" তারপর প্যারিস হাউজে বুকিং দিল ফোনে, হোটেল থেকেই ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট দিল, তারপর আরও ১ গ্লাস ককটেল। রায়হান ততক্ষণে ল্যাপটপ অন করে কি একটা কাজ শুরু করে দিয়েছে।

প্যারিস হাউজে যেতে হবে রাত ১১টায়। এখনও হাতে বেশ কিছু সময় আছে। বিয়ের দেড় মাস পর একটা এজেন্সিতে চাকরী পায় অপু। সুন্দর দেখে একটা দুই রুমের বাসা নেওয়া হল। ফকল্যান্ড দ্বীপের মত লনীর ক্লিভেজের যে আচিলটা নিয়ে বিয়ের আগে ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ চলত, বিয়ের ফলে তা পুরোপুরি ইংল্যান্ডের হস্গত হল, বিশেষ করে রাতের বেলায়। অপু কত হাজার বার আচিলটা ছুয়ে দেখেছে তবু প্রতিবার কলম্বাস-ভাস্কো দা গামার মত নতুন করে আবিস্কারের নেশা চেপে ধরে তাকে। প্রেম আর সংসার যে এক নয়, তা বুঝতে খুব মেধাবী হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু আচিলটা। সন্ধি বিন্দু শুধু আচিলটা।

"এখনও কি আচিলটা ছুতে ইচ্ছা করে?"

"হু করে।"

"তাহলে কি বাসায় ফিরে যাওয়া উচিৎ?"

"নাহ্।"

অপু নিজের কাছে প্রশ্ন করে।

৭৩ নম্বর রাস্তার মাথায় একটা দোতলা সাদা বাড়ি। এই বাড়ির দরজা জানালাগুলি কেউ কোনদিন খোলা দেখেনি। চারপাশে ১৫ ফুট উচু দেয়াল। তার উপর আবার তারকাটার জাল। পুরো বাড়িতে কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। গেটের সামনে গাড়ি দাড়াতেই অপু তার কোড নম্বরটা এসএমএস করল। গেটটা খুলে গেল। কোন লোকজন নেই। গাড়িটা একটা ডালিম গাছের নিচে পার্ক করে নামতে গিয়ে অপু বুঝল ককটেলটা ভালোই ধরেছে। ডালিম গাছে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলানো তাতে একটা পলাশ ফুলের ছবি। অপু তিক্ষ্ণ চোখে ছবিটা দেখে এলোমেলো পায়ে হেটে দরজা ঠেলে একটা ছোট রূমে ঢুকল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অপু দাড়িয়ে পড়ল। একটা নারী হাত তার হাত ধরে নিয়ে গেল আরেকটা রুমে। দুটি নারী হাত তার সব কাপড় খুলে ফেলল। তারপর হাত ধরে নিয়ে গেল একটা বড় হল রুমে। অন্ধকার তবু শব্দ শুনে মনে হল ঘরটা বেশ বড়। একটা ছোট টেবিলের উপর কয়েক টকরা কাগজ। একটা লেজার টর্চ জ্বেলে নারী কণ্ঠ বলল, "প্লিজ পিক আপ ওয়ান।" অপু একটা কাগজ তুলল। "ওপেন ইট।" অপু কাগজটা খুলল, তাতে লেখা '5'। তারপর টর্চ লাইটটা অফ করে সেই হাতটি তাকে নিয়ে গেল হল রুমের লাগোয়া একটা ছোট রুমে। অপুকে রুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে গাইড ফিসফিস করে বলল, "প্লিজ ফলো দ্যা রুলস্। ইটস ফর ইওর সেফটি, নো টক।"

দরজা বন্ধ হবার পর অপু রূমে দ্বিতীয় একটি সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করল। দুজন দুজনের হার্টবিটের শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারে হাতরে হাতরে সোফায় বসা একটি নগ্ন নারী শরীর আবিষ্কার করে অপুও পাশে বসল। তারপর সারারাত কেউই কোন কথা বলল না। এমনকি ক্লিভেজের আচিলে বেখেয়ালে তিন-তিনবার স্পর্শ করেও অপু চমকে ওঠেনি। খেয়ালই করেনি। অপুর মনে হল 'পরিচিত আর অপরিচিতি শরীরে আসলে কোন পার্থক্যই নেই।' ফজরের আযানের আধাঘণ্টা আগে গাইড এসে দরজা নক করে যখন অপুকে নিয়ে গেল তখন অপু তার রাতের সঙ্গীর প্রতি তেমন কোন অনুভূতি অনুভব করল না। এক ধরনের অনুভূতি শূন্যতা তার সারা শরীরটাকে আটকে রেখেছে।

প্যারিস হাউজ থেকে বেরিয়ে পার্কিংয়ের দিকে হাটতে হাটতে শাম্মী লনীকে প্রশ্ন করল, "কিরে কেমন লাগল?"

"আমি আসলে সারপ্রাইজড হতে ভুলে গেছি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের পাতায় জমে থাকা এক বিন্দু শিশির শাম্মীর মাথায় পড়ল। "আমিও! অথচ শিশিরের প্রতিটি বিন্দুতেই দূর্বা ঘাস নতুন করে সারপাইজড হয়।" শাম্মি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই মাইকে গান শোনা গেল-

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো..."

"দোস্ত চল ক্যাম্পাসে যাই।"

"নারে বাসায় গিয়ে ঘুমাতে হবে।" বলে শাম্মী লম্বা একটা হাই তোলে।

শাম্মীকে ছেড়ে দিয়ে লনী একটা রিক্সা নিয়ে ক্যাম্পাসে যায়। ততক্ষণে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। টিএসসিতে প্রচুর মানুষ আর 'রাজু ভাস্কর্যে'র বেদিতে বসে ঘাড় বাকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অপু। লনী গিয়ে পাশে বসে।

"চলো শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে আসি।"

অপু লনীর দিকে তাকায়। অপুর সন্দেহ হয়, সে কি সারারাত লনীর সাথে ক্যাম্পাসেই ছিল? দুজনে জুতা খুলে খালি পায়ে হাটতে হাটতে শহীদ মিনারে যায়।

মানব দূষণ

ঘুম থেকে উঠেই দরজার নিচে পড়ে থাকা 'দৈনিক দুরন্ত পথিক' পত্রিকাটি হাতে নেয় উইলিয়াম সব্বাহ। পত্রিকার লিড নিউজঃ

"জাতিসংঘ মানব দূষণ সম্মেলন আজ শুরু
দূষিত মানুষের পাশে দাঁড়ান'"

নিজস্ব প্রতিবেদক। তারিখ: ০৭-১২-২২০৯

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে আজ থেকে শুরু হচ্ছে জাতিসংঘ মানব দূষণ বিষয়ক সম্মেলন। কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে ৭ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে। এতে যোগ দিচ্ছেন জাতিসংঘের মানব দূষণ বিষয়ক কাঠামোর সদস্যভুক্ত ৪৯২টি দেশের প্রতিনিধিরা।

দূষণ বিষয়ক এই শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য হচ্ছে 'বিশ্বের দূষিত মানুষদের চিকিৎসার্থে এবং দূষণ প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে একটি বৈশ্বিক চুক্তিতে পৌঁছানো'। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর অবস্থান ভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে সবাই একমত যে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এই সম্মেলনের তুলনা ইতিহাসে মাত্র একবারই পাওয়া যায়। ২০০৯ সালের সেই সম্মেলন অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবারের এই সম্মেলন ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবেনা।

সাবেক আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত রাষ্ট্রসমুহ, সাবেক ইইউভুক্ত রাষ্ট্রসমুহ, আফ্রিকান কনফেডারেশন, মধ্য এশিয়ান ইউনিয়ন, চীন, ভারত, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা এ সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিটলার সাহা সম্মেলনের শুরুতে না থেকে তার ক্লোন পাঠানোর ঘোষণা দেওয়ায় বিশ্বের গণমাধ্যমে এ নিয়ে মৃদু সমালোচনা হয়েছে। সম্মেলনের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয় জাতিসংঘ ঘোষিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে থাকা দেশ হিসেবে বারবার আসতে থাকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান দেশ সমুহের নাম।

কোপেনহেগেন সম্মেলন বা কোপ-১৫ নামে পরিচিত এ সম্মেলনে ৩টি মৌলিক বিষয়ে চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছেন জাতিসংঘের প্রধান

মানব সম্পদ কর্মকর্তা চুং টুং। সম্মেলন উপলক্ষে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমাদের সামনে প্রশ্ন ৩টিঃ ১. আফ্রিকা ও ভারতের মতো শিল্পোন্নত দেশগুলো কতটা বেশি হারে কর্ম ঘন্টা কমাতে রাজি ২. ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তার তহবিল আদায়ে কীভাবে উন্নত দেশগুলোকে জড়িত করা হবে এবং ৩. কীভাবে এই তহবিল খরচ করা হবে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য বিশ্বের মানব দূষণ রোধ করা এবং এ বিপর্যয় মোকাবিলায় বৈশ্বিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করা।"

টেক্সাসের মানব সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বিল মাহমুদ কোপেনহেগেন পৌছে দৈনিক দুরন্ত পথিককে বলেন, "সম্মেলনে আমাদের দাবি হবে, 'ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঋণ নয়, সরাসরি অনুদান দিতে হবে'। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আর্থিক ও কারিগরি দুই ধরনের সহায়তাই আমাদের প্রাপ্য।" তিনি বলেন, "প্রাথমিকভাবে টেক্সাস ৭০০ হাজার কোটি 'আফ্রো' ক্ষতিপূরণ চাইবে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সম্মেলনে দরিদ্র দেশগুলির শ্লোগান হবে 'মানব দূষনের শিকার ইউরোপ-আমেরিকার পাশে দাঁড়ান'। এই শ্লোগানসংবলিত ৯০ হাজার স্টিকার বিভিন্ন গাড়িতে লাগানোর পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। টেক্সাস সেখানে প্রতিটি দেশকে একটি করে ফোল্ডার দেবে। এতে তাদের প্রণীত 'জাতীয় হিউম্যান পলুশন রোধ কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা ২২০৯'-এর হিন্দি-মান্দারিন সংস্করণ থাকবে।

অংশগ্রহণকারী ও পর্যবেক্ষক মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ সম্মেলনে অংশ নেবে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রনেতা, সরকারি প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকদের আগমনে কিছুটা হলেও উষ্ণ হয়ে উঠেছে শীতপ্রধান শহর কোপেনহেগেন ।

এই সম্মেলনের পাশাপাশি কোপেনহেগেনে একই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'হিউমোফোরাম০৯' নামে বেসরকারি পর্যায়ের একটি মানব সম্পদ সম্মেলন। এর আয়োজক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবী মানববাদী সংগঠন। গতকাল রোববার সম্মেলনকে সামনে রেখে উন্নত দেশগুলোর প্রতি মানব দূষণ কমানোর দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে আফ্রিকা ও ভারতের মানববাদীরা।

মানব দূষণ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ও এর দায় নিয়ে বিশ্ব বিভক্তই রয়ে যাচ্ছে। সম্মেলনের আগেভাগেই অংশগ্রহণকারী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে নিয়েছে। এর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জোট এলডিসি ছাড়াও ভারত-চীন-আফ্রিকার নিজস্ব স্বার্থভিত্তিক জোটও রয়েছে। মধ্য এশিয়ার মতো উন্নয়ণশীল অঞ্চলের সঙ্গে উন্নত ভারত-চীন-আফ্রিকার কর্ম ঘন্টা কমানো নিয়ে দ্বন্দ্বের মাঝখানে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান দেশ সমুহের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্বার্থ নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বিতর্ক হতে যাচ্ছে কোপেনহেগেন সম্মেলনে।

আফ্রিকা, ভারত ও চীন বাধ্যতামূলকভাবে কর্ম ঘন্টা কমাতে এখনো নারাজ। মধ্য এশিয়ান ইউনিয়নও বাধ্যতামূলক কোনো চুক্তিতে আগ্রহী নয়। আর উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান দেশ সমুহের দাবী "দৈনিক কর্মঘন্টা ৮ নির্ধারণ করতে হবে"। এই ত্রিপক্ষীয় টানাটানির মীমাংসা কোপেনহেগেন সম্মেলনে হবে কিনা এটাই এখন দেখার বিষয়।

সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও প্রভাবশালী আন্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গুলোও সম্মেলনে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। আরও যোগ দিচ্ছে ৪৯৮৫টি এনজিও।

উইলিয়াম পুরো নিউজটা পড়ল। কাল রাতে হুবহু এই নিউজটাই পাঠিয়েছিলেন তিনি, একটুও এডিট করেনি নিউজ এডিটর। কফি মেকার থেকে এক মগ কফি ঢেলে নিয়ে বারান্দায় যায় উইলি। হোটেল রুমের এই বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বেলা সেন্টার। বিরাট আয়োজন।

৩টা বাজার আধ ঘন্টা আগেই সম্মেলন স্থলে প্রবেশ করে উইলি। এই সম্মেলনের প্রস্তি চলছে গত এক বছর ধরে, হুলুস্থুল অবস্থা। যদিও এই সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে সবার মধ্যেই সংশয় আছে তবুও মিডিয়ায় এই সম্মেলনের ব্যাপক প্রচার চলেছে। যদিও উন্নত-অনুন্নত দেশগুলি স্পষ্টতই বিপরীত অবস্থানে দাড়ানো তবু সবাই কেন যেন সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী! উইলি বোঝে এই আশাবাদ ইন্ডো-আফ্রিকান মিডিয়া ক্যাম্পেইন ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন থেকে ঠিক দুইশ বছার আগে ২০০৯ সালেও এই শহরে ঠিক এই রকমই একটি সম্মেলন হয়েছিল। সেটি হয়েছিল পরিবেশ দূষন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে। সেই সম্মেলনটিও ব্যার্থ হয়েছিল। তারপর গত দুইশ বছরে পৃথিবী অনেক পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ-মালদ্বিপের মত অনেক নিচুদেশ তলিয়ে গেছে সাগরের তলে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসেনা। এই দেশগুলি বিশ্ব অর্থনীতির জন্যে কোন ফ্যাক্টর ছিল না। বরং ঢাকা-মালে এখন আন্ডার ওয়াটার সিটি নামে পরিচিত বিখ্যাত টুরিষ্ট স্পট। ভারতীয় পর্যটন কর্পোরেশনের অনুমোদন নিয়ে সেখানে ব্যাবসা করছে বেশ কয়েকটি টুরিষ্ট কোম্পানি, ফাইভ স্টার হোটেল। ঢাকার গুলশানে নিমিত হয়েছে 'এনজেলস্ বাথটাব', পৃথিবীর সবচেয়ে লাক্সারিয়াস আন্ডার ওয়াটার ফাইভ স্টার হোটেল। বিপুল অর্থ উপার্জন হচ্ছে এই আন্ডার ওয়াটার সিটি থেকে। উইলির পূর্বপুরুষ বাংলাদেশী ছিল। কিন্তু এই সব অবিচার নিয়ে কোন রিপোর্ট 'দুরন্ত পথিক' ছাপবেনা। বরং জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশাল ছবি ছাপা হবে আগামীকালের প্রথম পাতায় এবং সেই ছবিটাও তুলতে হবে তাকেই। পেট আর ইতিহাসের গেরিলা যুদ্ধ। একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে উইলি।

"নুহয়ের নৌকার মতই গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগ" উইলি মনেমনে হাসে "কিংবা বাইবেলের চেয়েও পবিত্র হবে এর ঘোষনাপত্রটি যার শেষ বাক্যটি হবে 'এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আবারও বসতে হবে এবং ঐক্যমতে পৌছাতে হবে'"। ভারত-চীন-ব্রাজিল-আফ্রিকান সাংবাদিকদের ব্যস্তার যেন শেষ নেই, আর কি তাদের হাফ-ভাব। পারলে সবাইকে প্যাকেট করে ক্যামেরার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। নির্ধারিত আসনে গিয়ে উইলি চুপচাপ বসল।

সম্মেলন স্থলের ঠিক বাইরেই মানববাদীদের বিক্ষোভ মিছিল। তারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী-আফ্রিকান প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর একজন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ গায়ে অকটেন ঢেলে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। সব ক্যামেরাম্যান-সাংবাদিক-ফটোগ্রাফারের দৃষ্টি এখন তার দিকে। কখন আগুন জ্বালাবে? দুর্লভ ছবি-খবর, মিস করা যাবে না। মুহূর্তের মধ্যে এই ছবি-খবর বিশ্ববাসাকে জানাতে পারলে ক্যামেরাম্যান-সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার হিট। একটি ড্রামে অকটেনও রেডি দেখা যাচ্ছে। কখন আগুন জ্বালাবে?? কয়েকটি কিশোর কাগজ-কলম নিয়ে এগিয়ে গেল হুমকিদাতার দিকে, তারা অটোগ্রাফ চায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হল। শুরুতেই ভারতীয় বিখ্যাত মুম্বাই ফিল্মের নাচ। কথক নৃত্য আর কামাসুত্রের ফিউশন এই নাচ সারাবিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। তারপর সম্মেলনের মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে মঞ্চে উঠলেন ব্রাজিলিয়ান শ্রমিক নেতা "পেলে টুং"। মি টুং শুরু করলেনঃ

"লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান। আজ আমরা সবাই মানব জাতিকে রক্ষার এক মহান ব্রত নিয়ে এখানে এসেছি। যদিও আপনারা জানেন", টুং একটু থামল তারপর আবার শুরু করল "তবুও আমার প্রবন্ধের শুরুতে ইতিহাসের কিছু ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর বিশ্বব্যাপি এক নতুন বিপ্লব শুরু হয়েছিল যার নাম "শ্রম বিপ্লব" এই শ্রম বিপ্লবের ফসল হিসেবে পৃথিবীতে একের পর এক বহুজাতিক এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানীর জন্ম হয়। শ্রম বিপ্লবের ফলে পুঁজির প্রবাহ এবং ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর অর্থনীতি অনেক গতিশীল হয়। পৃথিবী সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দূর্ভাগ্য তৎকালীন পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বন্ধুরাষ্ট্র সমুহ এই শ্রম বিপবকে অপব্যবহার করে নিজেদের পুজি বৃদ্ধির হার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল শুধু। একেক জন শ্রমিককে তারা ১২-১৪ ঘন্টা এমন কি ১৬ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য করত। বড় বড় পোষ্ট-মোটা বেতন-বাড়ি-গাড়ির লোভ দেখিয়ে তারা শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য করত। সেখান থেকেই "মানব দুষন" শুরু। তার

পরের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। ১৯৯০ সালের পর সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির পতনে এই কর্পোরেট অপকালচার এবং সেকারণে মানব দুষনের হার শুধু বাড়তেই থাকে। যদিও তখনও এই "মানব দুষন" টার্মটির জন্ম হয়নি।" পুরো অডিটরিয়ামে মৃত্যুর মতন নিরবতা। টুং একদম পিছনের সারির ডান পাশে বসা সুন্দরী ফ্রেঞ্চ শ্রম মন্ত্রীর সাথে আই কন্ট্রাক্ট করল।

"প্রিয় বন্ধুগন,আর এখন! মানুষ এখন ২৪ ঘন্টা অফিসে-কারখানায় থাকতে চায়। কেউ বাড়িতে যেতে চায় না। অফিসে সবাই সবার বসের বুট জুতা চাটে, চেটে পরিস্কার করে দেয়। শাইনার কোম্পানী গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংকাররা সারা দিন বসে বসে টাকা গুনছে। অকারণে টাকা গুনছে। মুখ থেকে থুতু নিয়ে টাকা গুনছে। গুনতে গুনতে এক সময় মুখের থুতু ফুরিয়ে যায়। তারপর আরেক জনের মুখের থুতু লোন নিচ্ছে। চড়া সুদে। তারপর থুতু গ্রহিতার মুখে যখন পরে আবার থুতু ফিরে আসছে সে তখন তার ঋনের থুতু ফেরত দিচ্ছে, সুদে-আসলে। পুরো ব্যাংক পাড়ায় থুতু বানিজ্য। এ সবই আপনারা জানেন।

সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভরা প্রোডাক্টের গুনাগুন নিয়ে জিকির করতে করতে ধ্যানে নিমগ্ন হচ্ছে। ধ্যানে গিয়ে তারা বিভিন্ন গায়েবী নির্দেশ পাচ্ছেন। এদের কোন কোনটির নাম 'ছহি সাবান নামা', 'মোবাইল সিম শরিফ' ইত্যাদি। ধ্যান ভেঙ্গে তারা একেকটি খানকাহ শরীফ খুলে নিয়ে বসছেন। নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন। 'সিম শরীক' ফলোকারী 'সিম' ধর্মাবোলম্বিদের সংখ্যা এখন অনেক বেশী, কোটি কোটি। 'ছহি সাবান নামা' ফলোকারী 'সবান' ধর্মাবোলম্বিদের অধিকাংশই অবশ্য নারী। এদের বিশ্বাস পরকালে এরা ক্লিওপেট্রা-ঐশ্বরীয়ার মত সুন্দরী হবে।" সুন্দরী ফ্রেঞ্চ শ্রম মন্ত্রী টুং এর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোট কামড়াল।

"ফিনান্স ম্যানেজাররা হিসাব করে বের করেছে তার কোম্পানীর এমপ্লয়ীরা প্রতিদিন কত লিটার ঘামে। সেই ঘাম দিয়ে কি পরিমান জলীয় বাষ্প হয়। সেই জলীয় বাষ্প দিয়ে কি পরিমান মেঘ হয়। সেই মেঘ দিয়ে কি পরিমান বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টি দিয়ে কতটুকু ফসল ফলে। তারপর তারা এইচ আর ম্যানেজারকে বলে কৃষকের কাছে ঐ পরিমান ফসল দাবী করতে, কারণ তা ঐ কোম্পানীর এমপ্লয়ীদের ঘাম শুকানো ফসল। পরিমানে কম হলেও এইচ আর ম্যানেজার এই ফসল কেটে নিয়ে আসে। এটা তাদের অধিকার। তারা অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন।

প্রিয় বিশ্বনেতৃবৃন্দ। এই হল বর্তমান অবস্থা, এই অবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে এইরূপ মানব দুষনের হাত থেকে আমাদের শ্রমিক সমাজকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আর সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে মানব দুষন

প্রতিরোধের নামে বর্তমান অর্থনীতির গতি যাতে হ্রাস না পায়। মানব দুষন যাতে রোধ হয় সেদিকে যেমন নজর রাখতে হবে তেমনি মহান শ্রম বিপ্লবের সুফল যাতে সবাই ভোগ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্যে আমাদের একটি কৌশল ঠিক করতে হবে। সেই কৌশল ঠিক করতে পারলেই এই সম্মেলন সফল হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই কৌশল ঠিক করি। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ"।

মুর্হুমুহু করতালিতে অডিটরিয়াম প্রকম্পিত হল। উইলিও বাধ্য হল একই ছন্দে দুহাত নাড়তে।

এই 'কৌশল' কি তা নিয়ে শুরু হল বিতর্ক। উন্নত বিশ্ব; ভারত-চীন-ব্রাজিল-আফ্রিকা চাচ্ছে শ্রমিকের জন্যে অবশ্য পালনীয় কর্মঘন্টা ১৮ থেকে নামিয়ে ১৪ ঘন্টা করতে। অপর দিকে দরিদ্রদেশ গুলি চায় তাদের শ্রমিকদের দিয়ে কোন অবস্থাতেই ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবেনা। কিন্তু বেতন দিতে হবে বর্তমান স্কেল অনুযায়ী। সম্মেলনের শেষ দিনেও যখন এবিষয়ে ঐক্যমত হলনা, তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় সবাই একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল। যে চুক্তিপত্রের মূল কথা হল, "এ বিষয়ে আমরা আবারও আলোচনায় বসব"। সমাপনী অনুষ্ঠানে আবারো শুরু হল মুম্বাই ফিল্মের ফিউশন নাচ।

এরপরদিন উইলির পত্রিকার শিরোনাম "মানব দূষণ সম্মেলন শতভাগ সফল"।

সূখী মানুষের জামা

অমর একুশে বই মেলা ২০১০। বইমেলার ঠিক মাঝামাঝি বড় স্টল 'প্রজন্ম'। স্টলের সামনে দাঁড়ানো নতুন লেখক 'শাহাবুদ্দিন সাজু'। এ বছর এই প্রকাশনী থেকেই তার প্রথম উপন্যাস এসেছে, নাম 'দেয়াল'। সাজু বেশ হাসি-খুশি সিম্পল মানুষ। বই মেলায় তার পরিচিত মানুষ অনেক। বড়ভাই-ছোটভাই-বন্ধু-পরিচিত-মুখচেনা।

পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে অনেকটা জোর করেই তার হাতে তুলে দিচ্ছে সাজু তার নিজের লেখা বই। কেউ হাসি মুখে, আবার কেউ বাধ্য হয়েই কিনছে বই। বিক্রি ভালোই হচ্ছে। সাজুকে ঘিরে জটলাও ভালোই জমেছে। অচেনা অনেকেই তাকিয়ে দেখছে লেখককে চেনার জন্যে। কেউবা এক ঝলক দেখে নাচিনে এগিয়ে যাচ্ছে। বইটি মেলায় এসেছে ৩ দিন আগে। এ পর্যন্ত এক জনও অপরিচিত মানুষ বইটি কেনেনি। অবশ্য তিনদিনে বিক্রি হয়েছে প্রায় একশ কপি। নতুন লেখকের বই হিসেবে সংখ্যাটি মোটেও কম নয়। শুধু সাজু নয়, অধিকাংশ নতুন লেখকের বই কেনে পরিচিত জনেরা, যাদের অনেকেই লেখক। নিজেরাই লেখে নিজেরাই কেনে। তবুও তারা খুশি। এই আনন্দ কৃত্রিম নয়। নিজেদের বই কিনতে কিনতে লেখক-কবিরা আড্ডা দেয়-কফি খায়। কখনও আলোচনায় চলে আসে সরকারী আমলা-বেসরকারী কর্পোরেট-রাজনীতিবিদেরা। এদের স্বার্থপর অর্থলোভী যান্ত্রিক জীবন নিয়ে লেখক কবিরা দু:খ করে। কেউ কেউ মুখে 'চুক চুক' শব্দ করে। নিজেদের স্বাধীন-নিরাসক্ত জীবন নিয়ে কেউ কেউ গর্ব করে। কেউ কেউ আবার আমলা-কর্পোরেট-রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন নিকৃষ্ট পশু পাখির বাচ্চা বলে গাল দিয়ে ওঠে। আড্ডা চলতে থাকে। সবাই একমত হয় আমলারা দুর্নীতিবাজ চামচা, রাজনীতিবিদেরা ভন্ড আর কর্পোরেটরা বিদেশীদের পা চাটা কুত্তা, পুঁজিবাদের দালাল।

জটলার ঠিক পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল রাতুল। আইবিএ থেকে বিবিএ শেষ করে রাতুল এখন ব্রিটিশ এমেরিকান টোবাকোর টেরিটরি অফিসার। ওর বউ ব্রাক ব্যাংকে চাকুরী করে। সেও আইবিএ গ্রাজুয়েট। রাতুল, সাজুর কলেজ ফ্রেন্ড এবং বেশ ঘনিষ্ঠ। ফেসবুকে প্রায়ই চ্যাট হয়।

"আরে মামা! এখানে?" ভীড় ঠেলে জটলায় ঢুকে রাতুল সাজুকে জড়িয়ে ধরে।

"দোস্ আমার নতুন একটা উপন্যাস এসেছে এবার। এই স্টলে।" সাজু বেশ গর্বিত।

"তাই নাকি! কই দেখি একটা বই! দে, অটোগ্রাফ দিয়ে দে।" রাতুল স্টল থেকে একটা বই কিনে এনে সাজুর হাতে দেয়। সাজু অটোগ্রাফ দেয় বইয়ে।

"তারপর, বই মেলায় কি প্রতিদিন আসিস?" সাজু প্রশ্ন করে।

"নারে দোস্, টাইম কৈ। আমার বউ হুমায়ুন আহমেদের চরম ফ্যান। ও ই ঠেলে ঠুলে পাঠাল.....দোস্ যাই তাহলে" বলে চলে গেলে রাতুল।

গুলশানের লা-সাইগন রেষ্টুরেন্টে ডিনারের জন্যে বসে আছে ৫/৬ জন আইবিএ গ্রাজুয়েট। ওরা রাতুলের বন্ধু। সপ্তাহে ৪/৫ দিন বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে ডিনার করে ওরা। রাতুলও এসে পড়ল। হাতে দুটি বই, একটি হুমায়ুন আহমেদের অন্যটি শাহাবুদ্দিন সাজুর।

"কিরে, কোথায় গেছিলি?" রাতুলের বন্ধু সাইফের প্রশ্ন।

"বইমেলায় গেলাম। আমার বউটা আবার হুমায়ুন আহমেদের চরম ফ্যান।" রাতুলের উত্তর।

"আর এটা কার বই?" সাজুর বই দেখিয়ে প্রশ্ন করে সেজান, ওদের আর এক ফ্রেন্ড।

"আমার এক কলেজ ফ্রেন্ড, সাজুর।" রাতুল বলে।

"দোস্, একটা বই বের করতে কয় টাকা লাগেরে? সব দেখি মাসরুমের মত কবি-সাহিত্যিক গজাইতেছে।" সাইফের প্রশ্ন।

"এই ধর ১৫/২০ হাজার টাকা।" তাচ্ছিলের সাথে সেজানের উত্তর।

"কেউ কেনে?" সাইফ প্রশ্ন করে।

"এই আমার মত বন্ধু-বান্ধবরা!" রাতুল হেসে উঠে বলে।

এর পর আলোচনা শুরু হল কবি-লেখকদের কর্মহীন জীবন নিয়ে। দেশের অর্থনীতিতে তাদের কোন অবদান নেই। উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা অনুপস্থিত। সেই জন্যেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এত পিছিয়ে আছে। দেশে এখন কাকের চেয়ে কবি বেশী। দেশীয় সংস্কৃতির ধোয়া তুলে তারা উন্নয়ন অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। একে একে আলোচনায় উঠে আসে সরকারী আমলা, রাজনীতিবিদদের কথাও। আমলারা অলস ঘুষখোর আর রাজনীতিবিদরা ধূর্ত এবং সিস্টেমবাজ। এই মুল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। এবং সেই সাথে চলতে থাকে বাফেট ডিনার। পাশের টেবিলে রাতুলের এক্স গার্লফ্রেন্ড লরা। রাতুল গিয়ে একবার 'হ্যালো' বলে আসল।

রাজনীতিবিদ-কবি-আমলা-সংবাদিকদের এক পশলা গালাগালি করে বেশ খুশি রাতুলরা। এই আনন্দ কৃত্রিম নয়। ওরা যা বলছে, তা ওরা বিশ্বাসও করে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ডিউটি-চাকরী-এক কোম্পানী থেকে আরেক কোম্পানীতে সুইচ-কখনও ছ্যাক হওয়া-মোটা বেতন-ক্রেডিট কার্ডের মোটা লোন-কারলোন-হাউজ লোন-ব্যাংককে শপিং সব কিছুতে ওরা অভ্যস্থ এবং স্বচ্ছন্দ। আনন্দের সাথেই করে এই সব কিছু বরং এর বাইরের অন্য জীবন গুলিকেই অ্যাবনরমাল মনে হয় ওদের।

রাত ১০টা বাজে। বই মেলার ঠিক বিপরীত পাশে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের মধ্যে বসে আছে চার বন্ধু। সাহেদের বাসা ধানমন্ডি ৫ নম্বর। লরার বাসা গুলশান। রফিক রাজাবাজার একটি মেসে থাকে আর ওলি থাকে কমলাপুর বস্তিতে। অ্যামেরিকান বার্গার যে রাংতা কাগজে পেঁচানো থাকে তার একটা নিয়ে এসেছে সাহেদ। ওলি এনেছে ৩টা ইয়াবা ট্যাবলেট। রাংতা কাগজের উপর একটা 'ওয়াই' রেখে নিচে লাইটার জালাল রফিক। ১০০০ টাকার একটা নতুন নোট পাকিয়ে চিকন পাইপের মত করল লরা। ওয়াই মানে ইয়াবা। উত্তপ্ত ওয়াই থেকে ধোয়া উঠছে। লরা টাকায় বানানো পাইপ দিয়ে টেনে নিচ্ছে সেই ধোয়া। সোজা গিলে ফেলছে ধোয়া। লরা এবার পাইপটা বাড়িয়ে দিল সাহেদকে। তারপর ওলি তারপর রফিক। ওদের চার পাশের পৃথিবী কখনও সাগরের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে। কখনও ফানুসের মত উড়ছে। কখনও টেনিস বলের মত ড্রপ খাচ্ছে। ওরা চার জন ভীষণ সুখী এখন। এই সুখ কৃত্রিম নয়। ওরা দেশ-জাতি-অর্থনীতি-যান্ত্রিক জীবন নিয়ে চিন্তিত নয়। শুধু সুখ। নিরেট সুখ। এক ধরনের সুখের আঠা ওদের ঘিরে রেখেছে। চার পাশের পৃথিবী একবার কাছে চলে আসছে একবার দুরে চলে যাচ্ছে।

পৃথিবীতে আসলে সবাই সুখি।

সময়ের ঝুল

২৬ ফেব্রুয়ারি ৩০১০ সাল । আলফা-রে কম্পিউটারে বসে কাজ করছে হ্যালিও। সে খুব ক্রিয়েটিভ মানুষ, একটা লোকাল ইন্টারনেট রেডিওতে কাজ করে, প্রযোজক হিসেবে। ইতিহাসের বিভিন্ন মজার মজার ঘটনা নিয়ে সে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান বানায়। খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, নাম "সময়ের ঝুল"। ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে সে এইসব মজার ঘটনা খুঁজে বের করে।

এক সময় পৃথিবীতে ধর্ম বলে এক ধরনের সংস্কৃতি ছিল। ধর্মের জন্যে কোটি কোটি লোক জীবন দিয়েছে। কত সন্ত্রাসী হামলাই না হয়েছে। ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল চলত, ডায়গনেস্টিক সেন্টার চলত, কোচিং সেন্টার চলত, দেশ দখল হত, উত্তর গেট গরম হত। চারিদিকে ধর্মগুরুদের জয়জয়কার। ধীরে ধীরে মানুষ পরকাল-বেহেস্ত-দোজখ-জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পরে। প্রমান বিহীন এক ধরনের সংস্কৃতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল ২৫০০ সালের ভার্চুয়াল যুগের মানুষ। তারপর আরও ৫শ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনকার মানুষ ধর্মের কথা ভুলেই গেছে। ধর্ম নিয়ে হ্যালিও'র তৈরি সময়ের ঝুলের 'এপিসোড-১' অনুষ্ঠান শুনে হেসে কুটি কুটি হয় এখনকার সময়ের তরুণ প্রজন্ম। হ্যালিও তার এপিসোড শেষ করে এই লাইনটা দিয়ে "এভাবেই মধ্যযুগে-আধুনিকযুগে ধর্মের নামে নিজেদের পেট-পকেট ভরত ধর্মগুরুরা"।

হ্যালিও ২য় এপিসোডটি করল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর পর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট দেশ দখল করে নিজেদের কলোনী বানিয়েছিল। এরপর কত মুক্তিযুদ্ধ, কত মুক্তিযোদ্ধা, কত ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা পেরিয়ে পৃথিবী এগিয়ে গেছে। চারিদিকে রাজনীতিবিদদের জয়জয়কার। আস্তে আস্তে পৃথিবীতে সব রাষ্ট্র মিলে গিয়ে একটি কনফেডারেশন তৈরি হয়। একজন প্রেসিডেন্ট সারা পৃথিবী শাষণ করেছে। ২৫০০ সালের কথা, তখন পৃথিবীতে কেবল ভার্চুয়াল

যুগের সূচনা হয়। মানুষের যাবতীয় যোগাযোগ-প্রয়োজন-শিক্ষা-বিনোদন-সেক্সের প্রয়োজন মেটায় ইন্টারনেট। দোকানের একটি মেশিনে এক হালি আপেল ঢুকিয়ে দিলে তা রুপান্তরিত হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ চলে যায় ক্রেতার বাড়িতে। সেখানে আবার আরেকটি মেশিনে ইলেক্ট্রোম্যাগানেটিক ওয়েভকে রিকনভার্ট করা হয় এক হালি আপেলে। সেই ২৫০০ সালেই প্রথম উদ্ভব হয় 'ইন্টারনেট রাষ্ট্রের'। প্রথমে ২টি রাষ্ট্র হল, একটি লিবারাল অন্যটি কনজারভেটিভ। মানুষ একটি ওয়েবসাইটকে ট্যাক্স পে করে, এবং বিনিময়ে যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং পরিচয় গ্রহণ করে। এই ওয়েবসাইট গুলিই ইন্টারনেট রাষ্ট্র। মানুষ ইচ্ছা করলেই এক রাষ্ট্র বাদ দিয়ে আরেক রাষ্ট্রের সার্ভিস গ্রহণ করতে পারে। কে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হবে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। এরপর আরও ৫শ বছর কেটে গেল। মানুষ এখন ইন্টারনেট রাষ্ট্রেরও বিকল্প খুজছে। ১১শ বছর আগের সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ-সীমান্ত সংঘাত এখন স্থান পেয়েছে জোকসের বইয়ে।

হ্যালিও রাজনীতি নিয়ে তার 'এপিসোড ২' শেষ করল এই সেন্টেন্সটা বলে "উনবিংশ-বিংশ শতাব্দিতে ন্যাশনালিজমের নামে রাজনৈতিক নেতারা মুলত নিজেদের চেয়ার এবং ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়েই বেশী ভাবত"।

এপিসোড-৩, বিষয়, ব্যবসা বানিজ্য। ১৯৯০ সালের পর থেকে তৎকালীন বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপক পরির্তন এসেছিল। দুনিয়ার তাবৎ মেধাবী ছেলে মেয়েরা বিবিত্র-এমবিএ করা শুরু করল। মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পণ্য উৎপাদিত হত তখন। কাজেই পণ্য গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, কে ক্রেতার মন জয় করতে পারে? বিবিত্র-এমবিএ করা কর্পোরেটদের উপর দায়িত্ব এসে পড়ল কিভাবে ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করা যায়। কর্পোরেটরা দারস্থ হল ক্রিয়েটিভদের। ফইন আর্টসে পাস করা ক্রিয়েটিভদের কাছে। তারাও অতি উৎসাহে দায়িত্ব বুঝে নিন। কর্পোরেট-ক্রিয়েটিভ মিলে শুরু হল মানুষদের প্রলুব্ধ করা, বোকা বানানো। এমন ভাবে পণ্যগুলির প্রচার চলল, যেন এগুলি শুধু পণ্য নয়, ঈশ্বর প্রদত্ত একেকটি বেহেস্তি ফল, একবার খেলে অমরত্ব নিশ্চিত। এভাবে ক্রেতা নিয়ে টানা হেচড়া চলল প্রায় তিনশ বছর । তারপর ক্রেতারা নিস্পৃহ হয়ে গেল। কোন বিজ্ঞাপণেই আর কাজ হয় না। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য অর্ডার দিয়ে তৈরি করে নেওয়া শুরু করল। গড়ে উঠল ছোট ছোট শিল্প কারখানা, যাদের সাথে ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ। কোন মিডল ম্যান, থার্ড পার্টি, এজেন্সি থাকলনা।

উৎপাদক-ক্রেতা সরাসরি কারবার। কর্পোরেট-ক্রিয়েটিভদের বাবসা লাটে উঠল। আরো প্রায় দুশ বছর পর এল "সলিড ই-ট্রান্সফার", ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের মাধ্যমে কারখানা থেকে পণ্য চলে যাচ্ছে মানুষের ঘরে। ধিরে ধিরে মানুষের প্রয়োজনও অনেক কমে এল। এখন ব্যবসা বানিজ্য হচ্ছে একান্ই ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে।

এই এপিসোডের শেষে হ্যলিও বলল "আশ্চর্য্য চরিত্র এই কর্পোরেট-ক্রিয়েটিভদের। এরা নিজেদের দাবি করত বিজনেস লিডার অথচ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এরা অন্যের পেট-পকেট, চেয়ার এবং ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়েই বেশী ভাবত, মুনাফা তুলে দিত মালিকদের পকেটে"।